শ্রী স্বপনকুমার

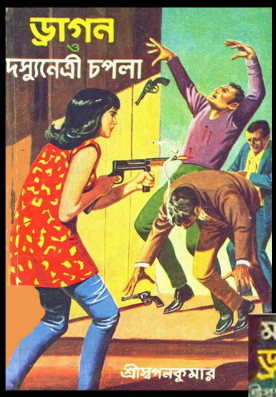

ড্রাগন

সমগ্র

প্রথম খন্ড

ড্রাগন সমগ্র

শ্রীস্বপনকুমার

রাধা পুস্তকালয়
৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নৃত্যে উৎসব	৫
ব্লাড হাউস	৭
একটি নরহত্যা	৯
মৃতের পরিচয়	১২
হরিভকত শর্মা	১৫
প্রতিজ্ঞা পালন	১৮
অবিশ্বাস্য ঘটনা	২১
দীপকের রহস্যভেদ	২৫
সফল অনুসরণ	২৭
ঘাঁটি থেকে সাগরে	২৯
সংঘর্ষ	৩১
মুখোমুখি	৩৩
মরণজয়ী ড্রাগন	
পরপর আঘাত	৩৫
ড্রাগনের ছোবল	৩৮
গোলক ধাঁধার পথে	৪১
কাঁটা দিয়ে কাঁটা	৪৫
নতুন শেঠজী	৪৭
সর্বনাশ সাধন	৫০
সূত্রের পথে	৫২
আবার হত্যার চেষ্টা	৫৫
বাঘের গুহার	৫৭
রতন বিপন্ন	৬০
আন্তর্জাতিক চক্রে ড্রাগন	
ভূগর্ভ কক্ষ	৬৪
চক্রান্ত জাল	৬৫
দিবালোকে ডাকাতি	৬৯
এক টুকরো নক্সা	৭১
মরণ যুদ্ধ	৭৫
মৃত্যুফাঁদ	৭৭
সাগরের বুকে	৭৮
পরিশেষে	৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
শত্রু হস্তে	৮২
নদীবক্ষে	৮৫
বিরাট ষড়যন্ত্র	৮৭
ডাকাতির পর ডাকাতি	৮৯
বাঘের গুহায়	৯১
মহাশূন্যে ড্রাগন	
বিভীষিকার মাঝে	৯২
নৃশংস হত্যা	৯৬
নবাব বনাম ড্রাগন	৯৯
মিনিওনেয়ার মিঃ বাসু	১০১
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১০৪
সংঘাত	১০৭
দীপকের অভিযান	১১১
নতুন তদন্ত পথে	১১৫
বৈজ্ঞানিক সেনের মহাশূন্যযান	১১৮
মহাশূন্যে ড্রাগন	১২০
পাতালপুরীতে ড্রাগন	
বিপদের মাঝে	১২২
লালবাজারের টেলিফোন	১২৪
ঘনীভূত রহস্য	১২৬
তদন্ত পথে দীপক	১৩০
কর্নেলের বাগানবাড়ী	১৩২
প্রাথমিক তদন্ত	১৩৪
তদন্তের সূত্র	১৩৭
জিজ্ঞাসাবাদ	১৪০
নক্সা চোর	১৪৩
কে এই লোকটা	১৪৫
রহস্যভেদ	১৪৭
পাতালপুরীতে ড্রাগন	১৫০
ড্রাগন ও দস্যুনেত্রী চপলা	
ভৈরবানন্দ ও নীলিমা	১৫৩
বিজয়ার মৃত্যু	১৫৭
পুলিশী তদন্ত	১৬২
রবীনের জবানবন্দী	১৮০

ড্রাগন সমগ্র

।। এক।।

নৃত্যে উৎসবে

ঝম্ ঝম্ ঝম্—

সুবেশা সুন্দরী তরুণীর নৃত্য চলেছে অবিরাম। যেন স্বর্গের অমরাবতীকেও হার মানায়।

আতরের সুবাস, বিরামহীন মাদকদ্রব্যের প্রকটিত প্রবাহ, বাজনা, নাচ আর গান—

এ যেন পৃথক জগৎ—অচেনা, অজানা।

রায়সাহেব বিরূপাক্ষের ঘরে আজ অনেক অতিথি—সবাই ধনী এবং অভিজাত।

সকলেই একমনে নাচ দেখছিল লক্ষ্ণৌ-র বিখ্যাত বাঈজী গেয়াবাঈয়ের।

অপূর্ব সুন্দরী। তেমনি দেহের সুষমা। আর তার সঙ্গে মিশেছে উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ বেশভূষা।

আর তেমনি নৃত্য। দেহের প্রতিটি রেখায় যেন ফুটে উঠেছে একটা উদ্দাম তরঙ্গ।

গান, বাজনা সব কিছুকেই ছাপিয়ে উঠেছে তার নৃত্য।

অতিথিরা তন্ময় হয়ে দেখছে—শুনছে।

হঠাৎ—অতিথিদের মনোনিবেশের মাঝে যেন হঠাৎ ছেদ পড়ল।

যেন ইন্দ্রের অমরাপুরীর নৃত্য-উৎসব হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

দপ্ করে আলোগুলো সব নিভে গেল আকস্মিকভাবে।

সবাই চঞ্চল!

সবাই উদ্‌গ্রীব।

একি হলো হঠাৎ? কেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল আলো!

আলো নেভবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল তবলার চাঁটি, সারেঙ্গির বাজনা, গায়িকার গীত আর নর্তকীর নৃত্য।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে—

মঞ্চের উপরে আবির্ভূত হলো দুটি ছায়ামূর্তি। প্রত্যেকের হাতে উদ্যত পিস্তল।

আর সেই সঙ্গে দর্শকদের ঠিক পেছনেও দেখা গেল, পিস্তল হাতে চারজনকে।

—হাত তুলুন সকলে। কেউ নড়বার চেষ্টা করবেন না।

দৃঢ়কণ্ঠে হুকুম ভেসে এলো।

—কে তোমরা? কি চাও?

—আমরা আইন মানি না। আর আমাদের আইনও আলাদা। মঞ্চের উপর থেকে একজন বলে উঠল।

—আমাদের আইনকে গ্রাহ্য করুন—তা না হলে এতটুকু নড়লে মৃত্যু অনিবার্য।

—উপস্থিত সকলে যার কাছে যা টাকা ও গয়না আছে তা স্টেজের দিকে ছুঁড়ে দিল। যিনি না দেবেন তাঁকে গুলি করে মারা হবে।

অতিথিরা বিভ্রান্ত।

এমন পরিবেশে পড়তে হবে, কেউ ভাবতে পারেনি।

আবার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—আমি হলুম ধনীত্রাস, পুলিসত্রাস, ভয়াবহ দস্যু ড্রাগন। যদি আপনারা টাকা-পয়সা ও মূল্যবান জিনিস দিতে ইতস্তত করেন, গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হব আমি।

সকলে ভয়ে ভয়ে তাদের সঙ্গে রাখা দামী সব জিনিস ছুঁড়ে দিল স্টেজের দিকে।

ড্রাগনের সঙ্গীরা সে সব নিয়ে একটা থলিতে ভরে ফেলল।

তারপর বললে—ঠিক আছে। আমরা এবার চলে যাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিগুলি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

তারপর দপ্ করে আবার জ্বলে উঠলো আলো!

সকলে ভাল করে দেখল।

কেউ নেই কোথাও!

তবে কারা এসেছিল?

বাড়ির মালিক এসে বললেন—এভাবে অপদস্থ হতে হবে আমাকে, তা আশা করিনি।

—কিন্তু ড্রাগন কে?

—কোলকাতা শহরে সবচেয়ে খ্যাতনামা দস্যু এই ড্রাগন। লোকটা অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে।

—সে কি!

—সত্যিই তাই। দেখলেন না কি কাণ্ড করলে?

—তা হলে এখন উপায়?

—উপায় তো ভাবছি।

—পুলিশে ফোন করুন।

—ফোন?

—হ্যাঁ। পুলিশে ফোন না করলে কোনও কাজ হবে না।

—ঠিক বলেছেন।

বাড়ির কর্তা সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে।

একটু পরে।

পুলিশ অফিসে সাড়া পড়ে গেল।

মিস্টার গুপ্ত বললেন—আবার ড্রাগন। শীগ্‌গির ছুটে চলুন।

—ও, কে, স্যার।

পুলিশবাহিনী তৈরি হয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলল ঘটনাস্থলের দিকে।

ঘটনাস্থল হলো দক্ষিণ কোলকাতার রাসবিহারী এভিনিউয়ে রায়সাহেব বিরুপাক্ষের বাড়ি।

বিরাট ধনী বিরূপাক্ষবাবু। বিরাট তাঁর ক্ষমতা।

তাই পুলিশ ত্রস্ত হয়ে উঠল।

একটু পরেই ভ্যান ছুটে চলল দক্ষিণ কোলকাতার দিকে দ্রুতগতিতে।

।। দুই।।

ব্লাড হাউণ্ড

—উঃ, ভয়ংকর! সাংঘাতিক!

মিস্টার গুপ্ত বললেন।

অতিথিরা বললে—কেন?

—কারণ এরা সব করতে পারে। এদের পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

—তার মানে?

—মানে এরা হলো ঠিক যেন রক্তলোলুপ একদল শয়তান।

—সে কি!

—ঠিকই বলছি। চারদিকে আজ শুধুমাত্র একটি রব ড্রাগন! ড্রাগন!! ড্রাগন!!

সকলে চুপ করে শুনল।

মিঃ গুপ্ত সব তন্নতন্ন করে দেখলেন। কিন্তু কোনও সূত্র পেলেন না।

একজন বললে—ঐ দেখুন, স্টেজে কি একটা পড়ে আছে।

মিঃ গুপ্ত সেটা তুললেন।

সেটা একটা কার্ড—তাতে ড্রাগনের একটা ভয়ংকর ছবি আঁকা।

মিঃ গুপ্ত বললেন—এটা ড্রাগনেরই নিশানা যে, সে এসেছিল।

—তা বটে।

—ড্রাগন কোনও প্রমাণ রেখে যায় না বিরূপাক্ষবাবু।

কিন্তু একটা কথা স্যার—

—কি কথা?

ড্রাগন কি করে আলো নেভাল?

—বোধ হয় ওদের একজন লোক আগেই ছিল মেন সুইচের কাছে।

—তা সম্ভব! কিন্তু তাকে ধরা যায় কি করে তা বলুন তো?

—ড্রাগনকে ধরা সহজ নয়। লোকটা অসাধ্যও সাধন করতে পারে।

—তা বটে।

—যা হোক, আমি ড্রাগনের কেসের যোগ্য তদন্তকারী দীপকবাবুকে জানাচ্ছি।

—সেটাই ভাল।

মিঃ গুপ্ত চলে গেলেন।

পরদিন।

সকালে দীপক সব ঘটনা শুনল।

বললে—এটা দু'একজন লোকের কাজ নয়—নিশ্চয় এর পেছনে বিরাট দল আছে।

—তা সম্ভব।

—আর সে দলকে ধরতেই হবে।

—কিন্তু এর মূল ব্যক্তিটি যে ড্রাগন তা তো শুনতে পেলেন।

—তা বটে। কিন্তু একটি কথা ভাবছি। ড্রাগন তো কখনো এ ধরনের কাজ করে না। আমার মনে হয় অন্য কোনও লোক যদি ড্রাগনের নাম ভাঁড়িয়ে ভয় দেখিয়ে এমন কাজ করে?

—তাও তো বটে!

—তা হলে তো বোঝা যাবে না কিছু।

—ঠিক কথা।

মিঃ গুপ্তকে বেশ চিন্তিত দেখায়।

দীপক বলে—আমরা এ পর্যন্ত ড্রাগনের যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে তার দ্বারা সব কাজই সম্ভব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তার প্রতিহিংসার তো কোনও কারণ দেখছি না। শুধুমাত্র কি টাকার লোভে ড্রাগনের মত দস্যু এমন বিপজ্জনক কাজে হাত দেবে? সে করে রেইনি ক্রাইম্। তার তো টাকারও অভাব নেই।

—তা ঠিক।

এমন সময়—

ঘন ঘন বেজে উঠল লালবাজারে মিঃ গুপ্তের ঘরের ফোনটা!

—হ্যালো কে?—মিঃ গুপ্ত বললেন।

—আমি ড্রাগন কথা বলছি।

—তুমি ড্রাগন? কি ব্যাপার বলো তো শুনি?

—ব্যাপার খুবই জরুরী অর্থাৎ, এমন একটা ব্যাপার ঘটেছে যে, আমাকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে হয়েছে।

—কি এমন ব্যাপার ঘটেছে যা তোমাকে এতটা উত্তেজিত করে তুলল?

—ব্যাপারটা একটু অসাধারণ। কোলকাতার বুকে দ্বিতীয় আর একজন ড্রাগন নামধারী দস্যুর আবির্ভাব ঘটেছে।

—তার মানে?

—মানে অতি সহজ। ড্রাগন বলতে আপনারা এতদিন শুধু জানতেন আমাকে। কিন্তু বর্তমানে আর একজন দস্যু, ড্রাগন নামে নিজের পরিচয় দিয়ে কাজ করে চলেছে। সে অন্য লোক। তার আসল নাম ব্লাড্ হাউণ্ড।

—সে কি কথা!

—ঠিকই বলছি। সম্প্রতি যে নৃত্য উৎসবে ডাকাতিটি সংঘটিত হয়েছে তা দ্বিতীয় ড্রাগনের কুকীর্তি।

—আশ্চর্য, এ তো বড় অসুবিধায় পড়া গেল দেখতে পাচ্ছি। তুমি কি পার না ঐ দ্বিতীয় ড্রাগনকে ধরিয়ে দিতে?

—পারি। হয়ত তা করতেও হবে। যতদিন তা না করতে পারি ততদিন যাতে আপনারা উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে না চাপান, তাই এই ফোন করতে হলো আমাকে।

—ঠিক আছে। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব তোমার ব্যাপারটি সল্‌ভ করতে।

—ধন্যবাদ।

মিঃ গুপ্ত রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

।। তিন।।

একটি নরহত্যা

দীপক এতক্ষণ ধরে সব কথা শুনছিল। সে বললে—তা হলে বর্তমানে দু'জন ড্রাগন এসে কেসটা আরও জটিল করে তুলল—তাই না?

—ঠিক তাই।

—কিন্তু যাই হোক না কেন, তবু আমাদের খুব হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে।

—কেন?

—ড্রাগনের কথায় বিশ্বাস কি?

—তা বটে।

—সে তো আমাদের ভাঁওতা দেবার জন্যও এরকম করতে পারে।

—তা পারে বটে।

—তাই এ বিষয়ে তদন্ত করে সঠিক না জেনে, কিছু করা উচিত হবে না।

—তা ঠিকই বলেছেন।

কয়েক মিনিট কাটল।

দীপক বললে—দ্বিতীয় ড্রাগনের পরিচয় পেতে আমার দেরী হবে না।

—কিভাবে?

—দ্বিতীয় ড্রাগন তো একজন সাধারণ ক্রিমিন্যাল মাত্র। তার অসম্ভব কোনও কাজ করার ক্ষমতা নেই। আসলে ড্রাগনের তুলনায় সে তো শিশু।

—তা বটে।

—তাই আসল ড্রাগন যে কাজে সফল হতে পারে, তা সব সময় ও পারবে না।

—সেটাই তো স্বাভাবিক।

—তা ছাড়া তার কর্মপদ্ধতি খুব একটা সিরিয়াস্ ও হতে পারে না।

—সেটা ঠিক।

—একটা চেষ্টা করলেই হয়তো তাকে ধরা যেতে পারে।

—সেটাই মনে করছি আমরা—অবশ্য যদি দু'জন ড্রাগন থাকে। তবে যদি এটা আসল ড্রাগনের চাল হয়, তা হলে বলার কিছু নেই।

দীপক বাড়ি ফিরে এলো।

সেদিন বিকেলে বাড়িতে বসে সে এ বিষয়ে কথা বলছিল তার সহকারী ও বন্ধু রতনলালের সঙ্গে।

এমন সময়—

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। তখন সন্ধ্যা সাতটা। দীপক রিসিভার তুলল।

—হ্যালো কে?

আমি মিঃ গুপ্ত কথা বলছি।

—কি ব্যাপার?

—আপনি এক্ষুণি একবার আসতে পারেন?

—কোথায়?

—গ্রে স্ট্রীট-সেন্ট্রাল এভিনিউ ক্রসিং-এর কাছে চিলড্রেন্স পার্কে।

—কেন?

—সেখানে এইমাত্র একটি মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে পুলিশ।

—কার মৃতদেহ?

—তা জানা যায়নি। শ্যামপুকুর থানার পুলিশ বিভাগ দেহটা পেয়ে ফোন করেছে আমাকে।

—কিভাবে মৃত্যু ঘটেছে?

—বুকে ছোরা মেরে।

—আশ্চর্য! সন্ধ্যাবেলায় পার্কে ছুরি মারল কে?

—তা জানা যায়নি।

—ঠিক আছে, আমি আসছি। আপনি ওখানেই চলে যান। ওখানেই দেখা হবে।

—ও. কে.।

মিঃ গুপ্ত রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

আধ ঘণ্টা পরে—

দীপকের গাড়ি এসে দাঁড়ালো সেন্ট্রাল এভিনিউ আর গ্রে স্ট্রীট ক্রসিং থেকে একটু দূরে চিলড্রেন্স পার্কের ঠিক সামনে।

মৃতদেহটা দেখে দীপক অবাক হলো। মিঃ গুপ্তও কম বিস্মিত হলেন না।

মৃতদেহের কোথাও অন্য কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। মারামারি বা ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্নমাত্র নেই দেহের কোথাও।

কেবল বুকের ডানদিকে গভীর ক্ষত।

দীপক বললে—কি বুঝছেন মিঃ গুপ্ত?

—বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার।

—আশ্চর্য নয়। এ ব্যাপারটা এখানে ঘটেনি।

—কেন?

—তা হলে পথচারীরা চিৎকারের শব্দ শুনতে পেত। লোক জমে যেত।

—তবে?

—অন্য কোথাও লোকটিকে বন্দী করে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। তারপর মৃতদেহটি এই পার্কে ফেলে যাওয়া হয়েছে।

—তা সম্ভব।

—দেখুন, পার্কের এদিকের কোণে পথের আলোটি যেভাবে আছে তাতে আধো অন্ধকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

—তা বটে।

—তাই গাড়িটা পথে দাঁড় করিয়ে মৃতদেহটা ফেলে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু মৃতদেহটা কার?

—তা তো জানি না। তবে দেহের কাছে ড্রাগনের কার্ড পেয়েছি।

—তবে ড্রাগনের কীর্তি। কিন্তু এই লোকটির পরিচয় জানা আবশ্যক।

—তা তো বটেই।

—তার জন্যে এক কাজ করুন।

—বলুন কি করা কর্তব্য!

—মৃতদেহটার ফটো কাগজে ছাপিয়ে দিন। তা হলে এর পরিচয় জানা সহজ হবে। আর বডিটা পোস্টমর্টেম করতে পাঠান।

—আচ্ছা।

দীপক একটু চিন্তা করে বললে—দেহে ছোরার আঘাতের চিহ্ন আছে বটে—তবে ছোরাটা নেই।

—না।

—তা হলে কোনও প্রমাণই পাওয়া অসম্ভব—যা থেকে এই খুনের কিনারা করতে পারা যাবে।

—আর কিছু করণীয় নেই?

—না। আপনি লালবাজারে যান। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

দীপক এগিয়ে চলল।

।। চার।।

মৃতের পরিচয়

দীপক যখন লালবাজারে পৌঁছল তখন রাত ন'টা বেজে গেছে।

মিঃ গুপ্ত সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন তার জন্যে। তিনি বললেন—কি ব্যাপারে জানেন।

—বলুন।

—মৃতের পরিচয় পেয়েছি।

—সে কি?

—হ্যাঁ। আমাদের রেকর্ড সেকশনের একজন অফিসার তাকে চিনতে পেরেছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তিনি বললেন, এই লোকটির নাম হলো মীরজা মহম্মদ। সে একজন পুরনো ক্রিমিন্যাল। মীরজা মহম্মদ ওরফে বলাইবাবু ওরফে বীরেশ্বর সিং এইরূপ তিন-চারটি নামে সে পরিচিত ছিল।

—বুঝেছি।

—এই লোকটি বর্তমানে যে দলে কাজ করছিল তাকে সকলে ব্লাড্ হাউণ্ড বলে জানে। অর্থাৎ, এক কথায় লোকটি ছিল ব্লাড্ হাউণ্ডের ডান হাত।

—আশ্চর্য তো!

—হ্যাঁ। এই লোকটিকে ধরার জন্যে পুলিশ বহু চেষ্টা করেও বিফল হয়। ব্লাড্ হাউণ্ডকে পুলিশ ধরতে পারেনি। সে এখন ছদ্মবেশে দ্বিতীয় ড্রাগন নাম নিয়ে অনেক অসৎ কাজ করে চলেছে। যাই হোক, আমার কাজ হলো এখন এই দ্বিতীয় ড্রাগনকে ধরা।

দীপক বললে—তা হলে এই কারণের জন্যেই বোধ হয় আসল ড্রাগন একে হত্যা করেছে।

—তা তো নিশ্চয়।

—কিন্তু ড্রাগনকে তো ধরা যায়নি আজ অবধি। একবার সে ধরা পড়েই পালিয়েছিল ফাঁসির মঞ্চ থেকে।

দীপক একটু হেসে বললে—আচ্ছা মৃত লোকটির কোর্টের কোন রেকর্ড ছিল কি লালবাজারে?

—তা ছিল। তা দেখেই তো একে চিনতে পারা গেছে।

—বুঝেছি।

মিঃ গুপ্ত বললেন—এখন আমাদের সাফল্যের একমাত্র পথ হলো ব্লাড্ হাউণ্ডকে ধরা। সে নিশ্চয়ই ড্রাগনের বিষয়ে অনেক কথা জানে।

—তা জানুক। তাকে ধরা অত সহজ নয়।

—তা তো বটেই।

মিঃ গুপ্তকে চিন্তিত দেখায়।

একটু পরে—

হঠাৎ ঝন্ ঝন্ করে টেলিফোন বেজে উঠল।

ফোন তুললেন মিঃ গুপ্ত।

—হ্যালো কে?

—আমি ড্রাগন কথা বলছি। আদি ও অকৃত্রিম দস্যু ড্রাগন।

—কি ব্যাপার?

—আমি স্বহস্তে ব্লাড্ হাউণ্ড নামধারী দস্যুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ যে লোকটি ছিল, তাকে হত্যা করেছি।

—জানি।

—তার পরিচয় জানেন আপনারা?

—নিশ্চয়।

—তবে তো বলার কিছু নেই।

—তুমি একথা বলতেই কি ফোন করেছিলে?

—হ্যাঁ।

—তবে আর তার প্রয়োজন নেই। আমরা ঠিক পরিচয় জেনে গেছি।

—আর একটা কথা—

—বল।

—শীগগীরই দেখতে পাবেন ব্লাড্ হাউণ্ডকেও তার সাগ্‌রেদদের মতো করবো।

—তা তুমি পার।

—তা করবোই। কারণ জানেন তো এক আকাশে দুই সূর্য বা দুই চাঁদ থাকে না।

—তা জানি।

—এর বেশি আর বলার কিছুই নেই। আর শীগ্‌গীর দেখতে পাবেন ড্রাগনের নবতম ক্রিয়াকলাপ শুরু হবে নতুন পথে।

—তার মানে?

—এটা বর্ণনা করে বলার কিছু নেই। নিজেরে চোখেই দেখতে পাবেন।

—ঠিক আছে।

—ড্রাগন রিসিভার নামিয়ে রাখে।

পরদিন সকালবেলা—

দীপক তার ল্যাবরেটরীতে নানা ধরনের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় ঘরে প্রবেশ করল তার সহকর্মী রতনলাল।

দীপক বললে—একটা নতুন আবিষ্কার করতে আজ সক্ষম হলাম রতন।

—আবিষ্কার?

—হ্যাঁ।

—কি রকম?

—দুটো ঔষধ আবিষ্কার করেছি। এর একটি যে-কোনও মানুষকে শোঁকালে, সে এক মিনিটের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়বে।

—আর দ্বিতীয়টি?

—সেটা শোঁকালে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান মানুষ জ্ঞান ফিরে পাবে।

—আশ্চর্য তো।

—সত্যিই আশ্চর্য! এই ঔষধ দুটি দিয়ে আমি অসাধ্য সাধন করতে পারি।

—আচ্ছা দেখি তো কেমন?

—দেখাচ্ছি।

দীপক রতনকে একটা বেঞ্চে শুইয়ে দিয়ে, তাকে একটা ঔষধ শোঁকাল, সঙ্গে

সঙ্গে রতন জ্ঞান হারালো।

দীপক এক মিনিট পরে অন্য একটা ঔষধ শোঁকাল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে রতন জ্ঞান ফিরে পেল।

—দেখলি তো?

—দেখলাম। সত্যিই আশ্চর্য! এ রকম অভাবনীয় ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

—এবার বিশ্বাস হলো তো?

—তা হলো। তা এটা তুই এত চেষ্টা করে কেন আবিষ্কার করলি?

—অনেক কারণে। অনেক সময়ে এই দুটি ঔষধ আমাদের খুব কাজে লাগবে।

—তা বটে।

দীপক দুটি শিশিতে ঔষধ দুটি ভরে রেখে দিল তার ড্রয়ারে।

রতন বললে—এখন কি কোনও কাজে বের হচ্ছিস দীপক?

দীপক মৃদু হেসে বললে—হ্যাঁ। ড্রাগনের ব্যাপারে আমি কি রকম ব্যস্ত, তা তো জানিস?

—তা বটে।

দীপক বেরিয়ে গেল।

রতন নানা চিন্তা করতে লাগল।

কিন্তু রতন তখন কল্পনা করতেও পারেনি যে, দীপকের কাছে একদিন ঐ ঔষধ দুটো কতটা প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিতে পারে।

।। পাঁচ।।

হরিভকত শর্মা

কোলকাতা শহরে হরিভকত শর্মার মতো ধনী লোক খুব কমই ছিলেন।

ভারতের অন্যতম পাঁচজন ধনীর মধ্যে হরিভকত শর্মা একজন। তিনি খুব সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। বহু গণ্যমান্য লোক তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করত।

ওঁর পরিবারে মাত্র চারজন লোক ছিল। পতি-পত্নী ও পুত্র-কন্যা।

তা ছাড়া ছিল দারোয়ান, ড্রাইভার, মালী, ব্রাহ্মণ, পবিত্র বিগ্রহ পূজারী। বাড়িতে মোট ন'টি প্রাণী।

সেদিন মিঃ শর্মার বাড়িতে বিরাট উৎসব চলছিল। তাঁর একমাত্র সুন্দরী কন্যা কুমারী ডলির জন্মদিন।

উৎসব, আনন্দ, গান, বাজনা, খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হলো। বারটায় সব শেষ হয়ে গেল।

অনেক রাত অবধি জেগে থাকার দরুন মিঃ শর্মা পরদিন খুব দেরীতে ঘুম থেকে উঠলেন।

সকলকে আগেই বলা ছিল যে, তিনি দেরীতে উঠবেন। বেলা আটটায় উঠে, মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক পাল্টে সাড়ে আটটা নাগাদ তিনি এলেন বৈঠকখানা ঘরে।

প্রতিদিনের মত তিনি ডাকের সব চিঠিগুলো খুলে নিয়ে বসলেন।

প্রথম চিঠিখানা খুলে পড়ে পাশে রেখে দিলেন তিনি। দ্বিতীয়খানাও তেমনি—বিজনেস্ লেটার। কিন্তু তৃতীয় চিঠিখানা পড়ে ভয়ে বিস্ময়ে তাঁর মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল।

তাঁর চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেল। যেন স্বয়ং মৃত্যু দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে।

তাতে লেখা ছিল—

মাননীয় হরিভকত শর্মাজী,

যদি এক্ষুনি এক লক্ষ টাকা আপনি আপনার লোক দ্বারা চৌরঙ্গীর কার্জন পার্কে না পাঠিয়ে দেন, তা হলে আজ রাত একটায় আপনার মৃত্যু অনিবার্য।

জীবনে বহু লোককে প্রতারণা করেছেন—তার ফল আপনাকে ভোগ করতেই হবে। আজ আপনি বহু লক্ষ টাকার মালিক। যদি টাকা না পাঠান তবে আজ শেষবারের মত ভগবানকে স্মরণ করে নিন, আর বিষয়সম্পত্তি সব ছেলে-মেয়ের নামে উইল করে দিন। ইতি—**ড্রাগন।**

চিঠিটা পড়েই হরিভকত শর্মার চেহারা শোচনীয় হয়ে উঠল।

সত্যি কথা বলতে গেলে মৃত্যুকে সকলেই ভয় করে। তা হলেও কিন্তু এক কথায় এক লক্ষ টাকা বের করেও দিতে তিনি রাজী নন। এত সহজে টাকা খরচ করলে, তিনি কখনোই এত টাকার মালিক হতে পারতেন না।

তিনি একটু ভাবলেন।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে চলে গেলেন তাঁর টেলিফোন রুমে।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং—

ঘন ঘন টেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো, দীপক চ্যাটার্জী, স্পিকিং—

—মিঃ চ্যাটার্জী, দয়া করে একবার আমার বাড়িতে চলে আসবেন?

—কোথায় যাব? এ কেমন কথা আপনার?

—ওহো স্যার, ক্ষমা করবেন। তাড়াতাড়ি ফোন করছি বলে ঠিকানা বলতে ভুলে গেছি। আমি হরিভকত শর্মা, শর্মা-নিবাস থেকে বলছি।

—ঠিক আছে।

—আমার জীবন বিপন্ন। দয়া করে আপনি অবশ্যই আসবেন কিন্তু।

—নিশ্চয়।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে দীপক রতনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রাইভেট কারটা এসে থামল শর্মা নিবাসের ঠিক সামনে।

দীপক গাড়ি থেকে নামল। মিঃ শর্মা নিজে এগিয়ে এসে দীপককে অভ্যর্থনা জানালেন।

—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী।

নমস্কার। কি ব্যাপার বলুন তো?

শর্মাজীকে রীতিমত চিন্তিত ও বিহ্বল মনে হল।

তিনি বললেন—আমাকে ভয় দেখিয়ে লেখা একটা অদ্ভুত চিঠি আজ পেয়েছি।

—চিঠি? কই দেখি?

শর্মাজী চিঠিটা এগিয়ে দেন দীপকের দিকে। দীপক ও রতন সেটা পড়ে।

রতন বলে—তা হলে দেখছি ড্রাগন আবার কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়েছে।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এ তো বড় সর্বনেশে কথা। এক্ষুনি দিতে হবে এক লক্ষ টাকা। তা না হলে নরহত্যা।

—সত্যিই এটা অন্যায়। কিন্তু এখন আমাদের তো কাজ শুরু করতে হবে।

—তা তো বটেই।

দীপক মিঃ শর্মার দিকে চেয়ে বললে—পুলিশে জানিয়েছেন কি?

—না, এখনো জানাইনি।

—কেন?

—পুলিশের হাতে কেস দিয়ে তেমন ভরসা তো পাই না। তাই—

—তা হোক। তবু ওদের সাহায্য দরকার। এখন আপনার প্রাণরক্ষার দায়িত্ব ওদের হাতে।

—তা বটে।

দীপক মিঃ গুপ্তকে ফোন করে সব জানাবার জন্যে রিসিভার তুলে নিল।

মিঃ গুপ্ত ফোন ধরলেন। দীপকের কাছে সব শুনে তিনি বললেন—ঠিক আছে, এক্ষুণি আসছি আমি, মিঃ চ্যাটার্জী। যেমন করে হোক, ড্রাগনকে ফাঁদে ফেলতেই হবে, যাতে সে এ কেসে সফল না হয়।

ঠিক আছে।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল।

দীপক তখন মিঃ শর্মাকে আশ্বাস দিয়ে বললে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

আপনি মারা পড়বেন না। পুলিশ বিভাগ আজ থেকে আপনার বাড়ি ঘেরাও করে রাখবে।

মিঃ শর্মা বললেন—তা হলে দস্যু ড্রাগন কি সত্যি খুব সাংঘাতিক স্যার।

—নিশ্চয়ই!

—তবে তো সত্যিই বিপদ?

—বিপদকে গ্রাহ্য করলেই তা বিপদ। তা না করলে কিছুই নয় জানবেন।

—তা তো বটেই।

মিঃ শর্মা মনে একটু বল পেলেন।

।। ছয়।।

প্রতিজ্ঞা পালন

শর্মা নিবাস।

বাড়ির সামনে দলে দলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।

বিনা অনুমতিতে কেউ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে বা বের হতে পারছিল না।

তাদের হুকুম দেওয়া ছিল যে, সন্দেহ হলেই যে কোন লোককে যেন গ্রেপ্তার করা হয়।

হরিভকত শর্মা তাঁর নিজের ঘরে বসে চুপচাপ ভাবছিলেন কত কথা। তাঁর সামনে বসেছিল সার্জেন্ট রণজিৎ আর তাদের সঙ্গে আরও একজন অফিসার।

মিঃ গুপ্ত আসেননি তখনো। তিনি কাজকর্ম শেষ করে সন্ধ্যা ছটায় আসবেন।

সময় কেটে চলে।

বেলা বারোটা বেজে গেল। একটা বাজে। তখনও দীপক বা রতন আসেনি সেখানে। খুব চিন্তিত মনে প্রতীক্ষা করছিল ওরা।

ঠিক একটা বেজে দশ।

দীপকের গাড়ি এসে দাঁড়াল ঠিক সে সময়ে শর্মা নিবাসের সামনে।

দীপক গাড়ি থেকে নেমে চারদিক ভাল করে পরীক্ষা করল।

সব ঠিক আছে।

তখন সে শর্মাজীর খাস কামরার দিকে এগিয়ে চলল। দীপকের বেশ চিন্তিত মনে হলো।

শর্মাজী বললেন—আপনি এলেন এতক্ষণে, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

—তার মানে?

—অতি সহজ। আপনার সাহায্য ছাড়া আমার প্রাণসংশয় অনিবার্য।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু এদিকে অন্য একটা কথাও আছে।

—কি কথা?

—আমি গোপনে সংবাদ পেলাম যে, ড্রাগনকে নাকি গত দু'দিন দেখা যায়নি কোলকাতায়। সে তার অনুচরদের সঙ্গেও দেখা করেনি।

সে কি!

—হ্যাঁ। একজন ইনফর্মার এ খবর এনেছে। একথা কতটা সত্যি তা জানি না।

—তা বটে। তবে কি সে এ অভিযান ত্যাগ করবে?

—তা নয়। বরং উল্টেই মনে হয়। এই অভিযানের জন্যে সে তৈরী হতে চায়—তাই সে এভাবে নিজেকে গোপন রেখেছে।

—তা সম্ভব!

দীপক বেশ চিন্তিত দেখাল।

ঢং ঢং....

বেলা পাঁচটা। তারপর দেখতে দেখতে বাজল সাড়ে পাঁচটা....ছয়টা।

ঠিক সাতটায় এলেন মিঃ গুপ্ত।

দীপক তাঁকে দেখে খুশী হলো।

রতন একজন সার্জেন্ট সহ ছিল হরিভকত শর্মার পাহারায়। আর দীপক, মিঃ গুপ্ত প্রভৃতি ছিলেন বাইরের ঘরে।

মিঃ গুপ্ত বললেন—এবার আর ড্রাগন বাবাজীকে আসতে হবে না।

দীপক বলে—কোন বেশে যে সে আসবে তা কে জানে?

—তা বটে।

—তার বেশ যখন জানি না, তখন জোর করে কিছুই বলা যায় না। কোন্ বেশে—কিভাবে যে সে আসবে তা বোধ হয় দেবতারাও বলতে পারবেন না।

ঠিক কথা।

মিঃ গুপ্ত বসে বসে রাস্তায় চলমান গাড়ীগুলি দেখছিলেন।

দীপক চুপচাপ বসে সিগারেট টেনে চলেছেন।

হঠাৎ—

পথের একটা চলমান গাড়ি থেকে কি একটা বস্তু যেন আচমকা স্প্রীংয়ে ধাক্কা লেগে ছিটকে এসে, যে ঘরে মিঃ শর্মা বসেছিলেন সেই ঘরের মধ্যে পড়ল।

মিঃ শর্মা বা রতন বুঝতে পারল না। শুধু একটা ঘটাং করে শব্দ হলো।

আচমকা শব্দ।

তারপরেই দেখা গেল প্রচণ্ড ধোঁয়ায় মিঃ শর্মার ঘরটা ভর্তি হয়ে গেল।

দীপক দৌড়ে গেল।

আশ্চর্য!

সারা ঘর ভয়াবহ বিষাক্ত ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দীপক দরজা খুলে, দম বন্ধ করে ঘরের মধ্য থেকে একে একে রতন ও মিঃ শর্মাকে টেনে নিয়ে এলো—

বাইরে এসে দীপক দেখে মিঃ শর্মার দেহে প্রাণ নেই। বিষাক্ত গ্যাসে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

দীপক বললে—মিঃ গুপ্ত, শিগগীর আমার পকেটের ঔষধ রতনকে একটু শোঁকান।

—কেন?

—দেখতেই পাবেন।

—ঠিক আছে।

মিঃ গুপ্ত তা করলে রতনের জ্ঞান ফিরে এলো ধীরে ধীরে।

রতন উঠে বসল।

দীপক বললে—কি ব্যাপার রে?

—কিছুই না তো আমি শুধু একটা শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর আর কিছু জানি না।

—ভয়ানক বিষাক্ত গ্যাসযুক্ত একটা গ্যাসবোমা চলন্ত গাড়ি থেকে ছুঁড়ে দিয়েছিল ঘরের ভেতরে।

—ওদের ধরা যায়নি?

—না।

—শর্মাজী?

—তিনি গ্যাসের ক্রিয়ায় মারা গেছেন। তোমারও মৃত্যু ঘটত, আর একটু দেরী হলেই।

—তা বটে।

—তুই বেঁচে গেছিস শুধুমাত্র ওই একটা ঔষধের গুণে—যা আমার নতুন নতুন আবিষ্কার।

রতনের মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হল না।

মিঃ শর্মার মৃত্যুর খবর পেয়ে আলুথালু বেশে মিসেস শর্মা ছুটে আসেন।

মিঃ শর্মার মৃতদেহের উপর তিনি লুটিয়ে পড়ে কান্না শুরু করে দেন।

দীপক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। বলে—আপনি দুঃখ পাবেন না মিসেস শর্মা—মৃত্যু একদিন না একদিন মানুষের জীবনে আসেই। তবে আমি ঠিকই হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

মিঃ গুপ্ত কোন কথা বলতে পারেন না। তিনি শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

।। সাত ।।

অবিশ্বাস্য ঘটনা

কোলকাতা থেকে অনেকটা দূরে শিয়ালদা লাইনে ক্যানিং পেরিয়ে সমুদ্র তীরে ছোট একটা শহর গড়ে উঠেছে সম্প্রতি।

এই অঞ্চলে কোলকাতা থেকে বহু অভিজাত নরনারী আসেন প্রমোদ-ভ্রমণে।

রতনকেও সেদিন সন্ধ্যাবেলা এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল।

রতন অবশ্য স্বেচ্ছায় আসেনি—সে এখানে এসেছিল বাধ্য হয়ে।

দীপক তাকে বলেছিল কয়েকদিন মিঃ শর্মার ফ্যামিলির উপর নজর রাখতে। রতন নজর রেখেছিল দূর থেকে ছদ্মবেশে।

এই সময় একদিন দেখতে পেলো যে, হরিভকত শর্মার ছেলে রামস্বরূপ সম্প্রতি খুব উড়ে বেড়াচ্ছে। পিতার মৃত্যুতে সে ততটা শোক পায়নি। সে একটি সুন্দরী মেয়ের পাল্লায় পড়েছে।

রতন দুদিন গোপনে তাদের ফলো করল। তৃতীয় দিনে দেখল সকালবেলা তারা প্রাইভেট কার নিয়ে রওনা হল ক্যানিং-এর দিকে।

সমুদ্রতীরের কাছেই হোটেল ডি-নাইট।

তারা দুজনে সেখানে উঠল।

রতন অবশ্য ঐ হোটেলে উঠল না—কারণ তা হলে সে ধরা পড়ে যেতে পারে।

সে উঠল একটা ছোট্ট সস্তা দামের উৎকলবাসী লোকের হোটেলে।

তবে সে সবসময় সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল। সে দেখতে পেলো যে, সেদিন সন্ধ্যায় রামস্বরূপ আর মেয়েটি হোটেল ডি-নাইটের একতলার উৎসব কক্ষে বসে আছে।

হোটেল ডি-নাইটের একতলার উৎসব কক্ষটি বেশ মনোরমভাবে সাজানো।

কোলকাতা শহরেও এমন বিলাসবহুল হোটেল খুব বেশি নেই।

সুন্দর সুন্দর চেয়ার-টেবিল—সারে সারে সাজানো।

মাঝখানে একটা মঞ্চের মতো ডায়াস। সন্ধ্যাবেলা সেখানে রোজ মদ্যপান ও সেই সঙ্গে নাচ গান হয়ে থাকে।

রতন ছদ্মবেশে সেদিন সন্ধ্যায় এখানে এসেছিল। তার মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। পরনে সাদা স্যুট, চোখে কালো চশমা।

রামস্বরূপ খেলাধূলায় ব্যস্ত ছিল।

রতন তা দেখে চুপচাপ একটা চেয়ারে একা বসে নাচ দেখতে লাগল।

একটু পরে একটি লেডি রিসেপ্সনিস্ট এসে প্রশ্ন করলে—কি চাই স্যার?

—ভাল খাবার আছে?

—হ্যাঁ, সব পাবেন।

—বেশ, চিকেন ফ্রাই আর পোলাও নিয়ে এসো জলদি।

—ও কে. স্যার। আর গার্ল ফ্রেণ্ড চাই না?

—গার্ল ফ্রেণ্ড?

—হ্যাঁ।

—আমি ওসব পছন্দ করি না। যাও।

—অলরাইট স্যার।

মেয়েটি চলে গেল। একটু পরে বয় খাবার দিয়ে গেল।

রতন চুপচাপ বসে খাবার খাচ্ছিল—এমন সময় একটি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী পাশে এসে প্রশ্ন করল—আমি একটু বসতে পারি?

রতন তাকাল।

মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। রতন আপত্তি করতে পারল না। বললে—বসুন।

—ধন্যবাদ।

মেয়েটা বসে পড়ে বললে—একটু বীয়ার আনাতে পারি কি?

—বেশ তো।

মেয়েটি বীয়ার আনাল। খাওয়া হলে রতনই দাম দিয়ে দিল।

এদিকে বাজনা চলছিল। স্টেজে মৃদু আলো জ্বলছে। স্প্যানিশ ড্যান্স শেষ হলো। এবারে বল ড্যান্স শুরু হবে।

রতন মেয়েটিকে প্রশ্ন করল—তুমি কি এখানে থাক নাকি?

—হ্যাঁ।

—কতদিন?

—প্রায় ছ'মাস। তবে নানা জায়গা ঘুরে বেড়াই ইচ্ছামত।

—তোমার নাম কি?

—লায়লা।

—অপূর্ব নাম তো?

লায়লা মিষ্টি হেসে বললে—চলুন, বলড্যান্স করবেন তো উঠুন।

রতন বিস্মিত। সে যেন এক কল্পলোকে বিরাজ করছিল।

সে আপত্তি করলো না। লায়লার সঙ্গে উঠে গেল স্টেজের দিকে।

নাচ শুরু হলো। নাচতে নাচতে রতন বললে—লায়লা, তুমি অপরূপ সুন্দরী বটে।

—তাই নাকি? আমাকে তোমার ভাল লেগেছে?

—নিশ্চয়ই! ইউ আর সো সুইট—

এমন সময় একটা বেয়ারা এসে নৃত্যবতী লায়লার কানে কানে কি যেন বলে চলে গেল।

লায়লা বললে—আমাকে যেতে হবে।

—কোথায়?

—একটু কাজে। নাচ তো শেষ হলো—এবার চলি?

লায়লা স্টেজের ভেতরে গেল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে পিছনের দিকে গিয়ে নামল।

রতন ডেকে বললে—লায়লা—আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

—না। তুমি জানো না, এ পথ সহজ নয়। এ পথ কণ্টকাকীর্ণ। তবু তুমি যদি আসতে চাও আমি বাধা দেব না।

—যারা ভালবাসে তারা বিপদের ভয় করে না।

—তা হলে তুমি আমাকে ভালবেসেছ? বেশ তবে এসো।

লায়লা হাত বাড়িয়ে দিল।

রতন তার হাত ধরে হোটেল থেকে বাইরে বের হলো। বাইরে রতনের গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। তাতে চড়ে বসল রতন! লায়লা তার পাশে বসল।

—কোন দিকে চালাবে?

—চলো উত্তর দিকে।

—বেশ।

রতন গাড়ি ছুটিয়ে দিল। পূর্ণবেগে গাড়ি ছুটে চলল উত্তর দিকে।

অবশেষে গাড়ি এসে পৌঁছল একটি জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে।

অন্ধকার রাত। উপরে আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। অন্ধকারের বুক চিরে রতনের গাড়িখানা এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে।

হঠাৎ রতন দেখতে পেল ঠিক রাস্তার উপরে বিরাট একটি গাড়ি পড়ে আছে। গাড়িটার কাছে গিয়ে গাড়ির ব্রেক কষে, রতন জোরে জোরে হর্ণ বাজাতে লাগল।

—কেন ব্যস্ত হচ্ছ? মনে হচ্ছে ও গাড়ি এত তাড়াতাড়ি যাবে না।

—কেন?

—এ পথ ভালোবাসার পথ নয় রতনবাবু। মুচকি হেসে বললো লায়লা।

—আমি এ পথে চলতে জানি।—বলে রতন পিস্তল বের করলো।

চমৎকার! ওটা খেলার সামগ্রী রতনবাবু।—বলে আচমকা লায়লা লাফ দিয়ে নিচে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে দেখা গেল তিনটি মূর্তি প্রত্যেকের হাতে পিস্তল।

একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল—সাবধান রতনবাবু। এতটুকু নড়লে, তিনটিগুলি আপনার দেহ ঝাঁঝরা করে দেবে।

—কে তুমি?

আড়াল থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আমিই দস্যু ড্রাগন। আর তোমার চারদিকে আমার বেষ্টনী আছে।

—তবে তুমি কি আমার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে চাও নাকি?

না। আমি তোমাকে আমার শক্তি দেখাচ্ছি।

—এখন জেলে গিয়ে তুমি তোমার শক্তির পরিচয় দাও। বুঝলে?

রতন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে কথাটা বললে।

—তুমি বুঝতে পারছ না, আমার শক্তি কত। দেখ আমি কি করতে পারি।

রতন বুঝতে পারল এরা তাকে এক নিমেষের মধ্যে চূর্ণ করতে পারে। সে বললে—না, আমি শক্তি পরীক্ষা করতে আসিনি।

—তবে ফিরে যাও।

—ঠিক আছে।

—আর তোমার কর্তাকে বলো, যেন আমার বিরুদ্ধে না লাগে।

—বেশ, বলব।

রতন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল দ্রুতগতিতে।

কেউ বাধা দিল না।

রতন অবশেষে তার বাসস্থানে ফিরে গাড়ির গতি বন্ধ করল।

রতন দেখতে পেল তার গাড়ির যে অংশে লায়লা বসেছিল, সেখানে সীটের সঙ্গে একটা চিঠি পিন দিয়ে আটকানো। তাতে লেখা ঃ—

প্রিয় রতনবাবু,

আপনি যে আপনার গাড়িতে করে আমাকে আমার আড্ডায় পৌঁছে দিয়েছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে দেখা হবে বলে মনে করি।

প্রীতি জানবেন। ইতি—লায়লা।

রতন চিঠিটা পড়ল।

তারপর সেটা রেখে দিয়ে একটা গোপন যন্ত্র বের করল। এই যন্ত্রের মাধ্যমে সে কলকাতায় দীপকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, তাকে সব কথা জানাল।

।। আট ।।

দীপকের রহস্যভেদ

পরদিন সকাল।

খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার আগেই হঠাৎ রতনের কানে ভেসে এলো একটি কণ্ঠস্বর। কে যেন তাকে ডাকছে—রতন, ওরে রতন—

—কে?

—আমি দীপক।

রতন উঠে বসল। দরজা খুলে দিল। দীপক তার ঘরে প্রবেশ করল।

—কি ব্যাপার রে?

—সব বলছি। আগে বোস, বিশ্রাম করে নে।

দীপক বসল। রতন সব ইতিহাস তাকে খুলে বলল। সব শুনে দীপক বললে—তুই বাজে কথা বলছিস না তো?

—তুই বিশ্বাস কর্—

—এর চেয়ে অনেক ভাল গল্প আমি তোকে কিন্তু শোনাতে পারি।

—তুই তা হলে আমার কথা বিশ্বাস করছিস না দীপক? এটা গল্প?

—তাই তো মনে হয়।

—তা হলে এই ছবি আর এই চিঠি?

দীপক ছবি দেখে ও চিঠি পড়ে বললে—এ ছবি পেলি কি করে?

—গাড়িতে তুলে নিয়েছিলাম।

—বুঝেছি। তা মেয়েটি দেখতে কেমন?

খুব সুন্দরী। ফর্সা রঙ, বড় বড় টানা টানা চোখ। পাতলা নাক। লম্বা গড়ন। তার ডান গালে ছিল একটা তিলচিহ্ন।

—আর কিছু?

—তার মাথায় চুলও ছিল প্রচুর।

—ঠিক আছে।

দীপক তখন একটা অ্যালবাম বের করল। পুরানো বহু মেয়ে ক্রিমিন্যালের ছবি তাতে সংলগ্ন ছিল।

দীপক বললে—দেখ্ ত, এর মধ্যে কেউ ছিল কি না?

রতন ভাল করে দেখল। একটির পর একটি ছবি দেখতে দেখতে, সে অবশেষে একটা ছবি দেখে থমকে দাঁড়াল।

বললে—এই মেয়েটিই মনে হয়। তবে—

—তবে কি?

—ছবির মেয়েটি কালো। আর ঐ মেয়েটি খুব ফর্সা। আর এর চুল বয়কাট। তার ছিল বড় বড় চুল।

—সব মেক্ আপ।

—কিন্তু এ কি করে সম্ভব? কালো রং কি করে ফর্সা হতে পারে?

—মেক্-আপে সবই হয়—বলে দীপক হাসল।

—এই মেয়েটি কে?

—এর নাম লায়লা নয়। এর নাম শেলী।

—শেলী?

—হ্যাঁ। এ কোকেন স্মাগলিং কেসে একবার জেল খেটেছিল।

—তাজ্জব বাত! আর সে-ই আজ কিনা নতুন নাম ধারণ করেছে?

—তা বটে।

—তা হলে আমরা একটা নতুন ক্লু পেলাম।

—ঠিক আছে। শেলী তা হলে এখন ড্রাগনের দলে যোগ দিয়েছে?

রতন কোনও উত্তর দিল না।

একটি ভয়ংকর ও নির্জন জঙ্গল।

এখানে বড় বড় সাপ ও হিংস্র জন্তুরা সব অবাধে বিচরণ করে।

এখানে প্রায় সাত-আটশো ফুট গভীর একটা খাদ আছে। তাকে সকলে বলে মৃত্যুখাদ বা মরণ-খাদ!

সেদিন রাত ন'টা।

ঝম্ ঝম্ করে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছিল এই অঞ্চলে।

এমন সময় একটা মোটর গাড়ি ছুটে এলো গভীর খাদের দিকে। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে গাড়িটা অবশেষে নেমে এলো এই মৃত্যুখাদে।

গাড়ি থেকে একজন ফোন তুলে কথা বলল—হ্যালো জিরো ওয়ান—জিরো ওয়ান্—

উত্তর ভেসে এলো—ও.কে.।

—হ্যাঁ কর্তা। আমি জিরো ওয়ান্ কথা বলছি।

—মার্কা?

—ড্রাগন।

—কি খবর বল।

—দীপক এসে গেছে।

—ঠিক তো?

—হ্যাঁ, কর্তা।

—ও. কে.। তুমি ভেতরে যাও।

একটা গোপন সুড়ঙ্গপথ দেখা গেল! মোটর গাড়িটা সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল।

জিরো ওয়ানের ড্রাইভার ভাবল এই পৃথিবীর কেউ জানতে পারল না এই চক্রান্তের খবর।

কিন্তু তা কি সত্যি গোপন থাকল?

পরবর্তী ঘঠনাবলী দেবে তার প্রমাণ।

।। নয়।।

সফল অনুসরণ

সেদিন সন্ধ্যায়।

হোটেল ডি-লাইটের একটি কোণে যে পাঞ্জাবী লোকটিকে বসে বসে খাবার খেতে দেখা গেল, সেই যে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী তা বোঝা যায় না।

রতন আজ সেখানে আসেনি। সে আজ অন্য এক ছদ্মবেশ নিয়েছে। বড় বড় চাপদাড়িযুক্ত যে ভিখারীটা একটু দূরে পথের ধারে ভিক্ষা করছিল, সে ছদ্মবেশী রতনলাল।

অন্যদিনের মতোই আজও চলছিল আনন্দ উৎসব। দলে দলে লোক জমা হয়েছিল। আর সব টেবিল ভর্তি।

আটটা বাজল।

সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল অর্কেষ্টা। নাচ গান শুরু হয়ে গেল।

দীপক তীক্ষ্নদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল সব কিছু। প্রতিটি মেয়েকে সে ভাল করে লক্ষ্য করছিল।

সাধারণ নাচ হলো তারপর শুরু হলো জিপ্সী ড্যান্স।

চারটি মেয়ে নাচছে তাণ্ডব নৃত্য। তাদের মধ্যে একটি যে শেলী তা দীপকের চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

দীপক লক্ষ্য রাখল।

আধঘণ্টা পরে নাচ শেষ হলো।

পরে আবার শুরু হবে।

এমন সময় একটি বেয়ারা এসে শেলীর কানে কানে কি যেন বললে!

শেলী চম্‌কে উঠল।

একটু পরেই গ্রীণরুমে গিয়ে পোশাক ছেড়ে সে বের হলো পথে।

সঙ্গে সঙ্গে ফলো করল দীপক।

হোটেল থেকে বেরিয়ে তার পিছু নিল। রতনকে ইঙ্গিতে বললে তাকে ফলো করতে।

শেলী কিছুটা হেঁটে একটা রাস্তার মোড়ে গেল। একটা গাড়িতে উঠল সে ধীর পায়ে।

দীপক বুঝেছিল, শেলী এ দলের সঙ্গে জড়িত ওতপ্রোতভাবে।

সে একটা ট্যাক্সিতে উঠে ফলো করল। রতনও চলল সঙ্গে।

দুটি গাড়ি দীর্ঘক্ষণ ধরে ছুটে চলল কিছুটা দূরত্ব রেখে! মৃত্যুখাদ থেকে কিছুটা দূরে গাড়ি রাখল শেলী।

দীপক দেখল দূর থেকে। সে আর গেল না সেদিকে।

শেলীর গাড়িটা থেমে যেতেই তারা নেমে অদৃশ্য হলো।

দীপক ফিরে চলল।

কিছুদূর গিয়ে সে একটা বড় দোকানে ঢুকে পড়ল। তারপর পকেট থেকে ওয়্যারলেস সেট বের করে খবর দিল থানায়—

—হ্যালো, দীপক চ্যাটার্জী স্পিকিং।

—কি ব্যাপার?

—ভয়াবহ। ড্রাগনের ঘাঁটি পেয়েছি।

—ঠিক আছে।

—সাবধান! কাম্ শার্প—

—ও. কে. স্যার। কোথায় থাকতে হবে তা বলুন?

—ভ্যারাইটি স্টোর থেকে বলছি। এখানে আসুন।

ঠিক আছে।

দীপক প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আধঘণ্টা পরে—

দুটি পুলিশ ভ্যান এসে গেল ভ্যারাইটি স্টোরের সামনে।

—কি ব্যাপার?

—আমাদের এক্ষুণি রেড করতে হবে। ড্রাগনের আড্ডা হলো ঐ মৃত্যুঘাঁটি।

—ড্রাগনের আড্ডা—মৃত্যুঘাঁটি?

—হ্যাঁ।

—সেখানে মানুষ থাকে কি?

তা জানি না। তবে তারা থাকে। এটা সমুদ্রতীর। মনে হয় একটা গুপ্তপথে সাগরের সঙ্গে যোগ আছে।

—কেন?

—সমুদ্রপথে বোধ হয় বিদেশ থেকে স্মগলিং মাল আসে।

—হতে পারে। কিন্তু পথ তো জানি না।

—ঠিক আছে—আমি আগে যাচ্ছি। আপনারা ফলো করুন।

—ও.কে.।

দীপক প্রস্তুত হলো।

।। দশ।।

ঘাঁটি থেকে সাগরে

—দীপক একা একা চলল আগে।

সোজা তিন-চারশো ফুট নীচে মৃতুঘাঁটি নেমে গেছে।

নামবার পথ আছে ডানদিকে—আর তা আঁকাবাঁকা।

বেঁকে বেঁকে পথ নেমে গেছে পাক খেয়ে খেয়ে, চওড়া পথ।

দীপক পথ ধরে চলল। পেছনে পেছনে ছদ্মবেশে চলল পুলিশবাহিনী।

অবশেষে পনেরো মিনিট চলে তারা নীচে নেমে এসে দেখে, একটা বড় চওড়া জায়গা—ফাঁকা জায়গা সেটা।

ও. সি. বললেন—বাড়ি ঘর তো নেই।

দীপক বললে—আছে।

—কোথায়?

—মাটির নীচে।

—আশ্চর্য! পথ কোথায়?

দীপক ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল। একটু পরে সে সুড়ঙ্গের মুখ পেল।

একটা সুইচ্ টিপল। বিরাট সুড়ঙ্গ পথ দেখা গেল। সেটা এত বড় যে, সে পথে মোটর গাড়ি পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে।

দীপক চলল। পেছনে পুলিশবাহিনীতে দশ বারোজন। প্রত্যেকের হাতে উদ্যত বন্দুক ও পিস্তল।

—হঠাৎ—

সামনে দেখা গেল দুটি কালো মূর্তি।

—কে ওখানে?

—হ্যাণ্ডস্ আপ। হাত তোল, না হলে মাথার খুলি উড়ে যাবে।

দীপকের বজ্রস্বর।

হাত তুললে লোক দুটি।

দীপকের নির্দেশে ও. সি. তাদের বেঁধে ফেললেন।

ও. সি. বসলেন—আরও আছে?

—হ্যাঁ, ভেতরে চলুন।

সঙ্গে সঙ্গে—

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসতে লাগল বাড়ির ভেতর থেকে।

—ফায়ার!

দীপক আদেশ দিল।

গুলি বিনিময় চলল। প্রচণ্ড বেগে অবিরাম গুলিবর্ষণ হতে লাগল।

দীপক বললে—সাবধান! ড্রাগন বড় সাংঘাতিক লোক। পালাতে পারে।

—তা বটে।

অবিরাম গুলি চলছিল।

হঠাৎ একজন সিপাহী আহত হলো।

দীপকও সমানে গুলি চালাতে লাগল।

তারপর হঠাৎ এক সময়ে বিপক্ষের গুলি চলা বন্ধ হয়ে গেল।

দীপক বললে—কি হলো? ওরা কি ভয় পেয়ে গেল নাকি?

—তাই তো মনে হয়।

দীপক এগোল।

বিরাট বাড়ি। সব মাটির নীচে। স্যাঁতসেতে ঘর।

কিন্তু কোনও ঘরেই লোক নেই।

এমন সময় শোনা গেল একটি শব্দ। ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্....।

—কি হলো?

—বোধ হয় সাগরে যাবার কোনও গোপন পথ আছে—দীপক বললে।

—তা হবে।

—সুড়ঙ্গপথে সাগরের সঙ্গে যোগ আছে এই মৃত্যুঘাঁটির।

—সত্যিই তাই—

দেখা গেল একটি করে মোট তিনটি মোটর লঞ্চের মতো জিনিস সাগরে নেমে গেল। তারা ছুটে চলল।

দীপক বললে—ওগুলোর সব কটা লঞ্চ নয়।

—তবে?

—সাবমেরিনও আছে।

—সাবমেরিন?

—হ্যাঁ। ড্রাগন হয়ত দ্রুতগামী সাবমেরিনে চড়ে পালাচ্ছে।

—সর্বনাশ! ধরতেই হবে।

দীপক এগিয়ে গেল সমুদ্রের ধারে। দীপক এবং ও. সি. দুটি জল পুলিশের স্টিমারে চাপল।

এই স্টিমারে কামান পর্যন্ত ফিট করা ছিল। আর ছোট জাহাজের মতো প্রায়। দীপকরা সদলে ছুটল ড্রাগনের পেছনে।

। এগারো ।।

সংঘর্ষ

দ্রুত চলেছে সামনের দুটি লঞ্চ আর একটা সাবমেরিন। প্রচণ্ড বেগে।

দীপকরা অনুসরণ করে চলল সমান দ্রুতগতিতে।

কিন্তু আশ্চর্য—

শত্রুদের গতি দুর্নিবার। কিছুতেই যেন ধরা যাচ্ছে না।

দীপকও গতি বর্ধিত করল।

কিন্তু তবু দু'দলের মধ্যে পার্থক্য কিছু কমলেও তারা অনেকটা দূরে অবস্থান করছিল।

দীপক তখন কামান দাগতে অর্ডার দিল। পুলিশ-স্টিমার থেকে কামান গর্জন করে উঠল।

গুড়ুম! গুড়ুম!

সাগরজল যেন কেঁপে কেঁপে উঠল সে প্রচণ্ড শব্দে।

দীপক দেখল শত্রুপক্ষের লঞ্চ দুটি সাদা পতাকা উড়তে লাগল। তার মানে তারা আত্মসমর্পণ করতে চায়।

দীপক বললে—শত্রুর লঞ্চে উঠে পড়ুন।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-স্টিমার গিয়ে ভিড়ল শত্রুপক্ষের লঞ্চের গায়ে।

দুটি লঞ্চ থেকে গ্রেপ্তার করা হলো দশ-বারোজন লোককে।

দীপক দেখল তারা অধিকাংশই গুণ্ডা ধরনের লোক।

তবে তার মধ্যে মাঝি মাল্লা ধরনের লোকও কিছু আছে।

তাদের বন্দী করে রাখা হলো স্টিমারের দুটি কক্ষের মধ্যে।

শত্রু-লঞ্চ দুটি বেঁধে নেওয়া হলো তাদের স্টিমারের সঙ্গে।

কিন্তু আশ্চর্য—

সাবমেরিনটি অনেক আগেই জলের তলায় ডুব দিয়েছিল।

তার কোন পাত্তা মিলল না।

দীপক তখন যেদিকে সাবমেরিনটি গেছিল, সেদিকে স্টিমার চালাল পূর্ণগতিতে।

কিছুদূর গিয়ে দীপক ভাল করে দূরবীন দিয়ে কি যেন দেখতে লাগল। হঠাৎ চোখে পড়ল দূরে কি যেন একটা বস্তু জলের উপরে দেখা যাচ্ছে।

দীপক বললে—দেখুন তো মিঃ গুপ্ত—

—কী?

—ঐ যে জিনিসটা জলের উপরে ভাসছে, একটা সরু নলের মতো, ওটা কি বলুন তো?

—কি?

—ওটা সাবমেরিনের পেরিস্কোপের নল।

—তা হলে ওর নীচে সাবমেরিনটি চলেছে?

—হ্যাঁ।

—ফায়ার করব?

—তা করতে পারেন। কিন্তু তাতে লাভ হবে কিনা, তা বুঝতে পারছি না।

—কেন?

—কারণ, জলের তলে কামানের গোলা কাজ করবে কিনা তার স্থিরতা নেই।

—তা বটে। কিন্তু একটা কথা—

—বলুন?

—একটা ডেপথ্ চার্জ আছে। সেটা চার্জ করতে পারি।

—তাতে কাজ হবে কিনা ঠিক নেই। না হলে সেটাও ব্যর্থ হয়ে যাবে।

—তা বটে।

—তা হলে উপায় থাকবে না আর।

যা হোক, পরামর্শ করে স্থির হলো স্টিমারের মধ্যে যে ডেপথ্ চার্জ আছে তা সাবমেরিন লক্ষ্য করে চার্জ করা হবে।

কয়েক মিনিট কাটল।

সাবমেরিনকে লক্ষ্য করে ডেপথ্ চার্জ ছোড়া হলো।

একটা বিকট শব্দ হলো।

একটু পরে দেখা গেল, ডেপথ্ চার্জটি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেছে সাবমেরিনকে। জলের উপরে তেল ভেসে উঠল।

একটু পরে ভাঙা সাবমেরিনটিকে দেখা গেল উপরে ভেসে উঠতে।

সকলে আগ্রহভরে খুঁজে দেখল।

সাবমেরিনে কোনও লোকের অস্তিত্ব নেই।

দীপক বললে—আশ্চর্য--

—তাই তো—বললেন ও. সি.—কোথায় গেল ঐ সাবমেরিনের আরোহীরা।

দীপক বললে—আরোহী বোধ হয় ছিল মাত্র একজন। সে ড্রাগন।

—তাই মনে হয়।

—দলের কোন লোককে সে বিশ্বাস করে সঙ্গে নেবে না।

—তা ঠিক। তবে কি ড্রাগনের দেহটা হাঙর-কুমীর টুকরো টুকরো করে খেয়েছে?

—তা অসম্ভব নয়।

একটু থেমে দীপক বললে—ড্রাগন ডুবুরীর পোষাক পরে হয়ত জলের তলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

—তা সম্ভব বলে মনে হয়।

দীপক একটু চিন্তা করল।

তারপর বললে—ড্রাগন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হলে আমাদের একজন জলের তলে নামা উচিত।

—তা বটে।

—তবে কে নামবে?

—আমি।

দীপক বললে—না। আমিই ডুবুরীর পোশাক পরে নামব।

—আপনি?

—হ্যাঁ।

—বেশ।

দীপক ডুবুরীর পোশাক পরে হাতে একটা ছোরা নিয়ে জলে নেমে পড়ল।

উপরে সকলে ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল ড্রাগনের আশায়।

।। বারো।।

মুখোমুখি

সময় কেটে চলল।

দীপক জলের তলে নামল! সে মাঝে মাঝে উপরে সংকেত পাঠাচ্ছিল।

ড্রাগনকে কিন্তু দেখা গেল না।

কোথায় ড্রাগন?

শুধু মাঝে মাঝে দেখা যায় মাছ. হাঙর, অক্টোপাস প্রভৃতি।

স্বচ্ছ জল।

অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়—বেশ ভাল করেই দেখা যায়।

দীপক এগিয়ে চলল। চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল সে।

হঠাৎ—

দূরে দেখা গেল কি যেন একটা আসছে এদিকে। কি ওটা?

তাই তো স্পষ্ট দেখা গেল; একজন ডুবুরীর পোশাক পরা লোক।

দীপক চলল ডুব সাঁতার দিয়ে।

ড্রাগন কিন্তু ভয় পেলো না। দ্রুত সাঁতরে আসতে লাগল দীপকের দিকে।

দীপক প্রস্তুত।

মুখোমুখি দেখা হলো দু'জনের। দীপকের হাতে ছোরা।

দীপক ছোরা তুলল ড্রাগনকে আঘাত করার জন্যে।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ড্রাগন দীপকের ছোরাসুদ্ধ হাতটা ধরে ফেলল।

দু'জন প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি শুরু হলো। ড্রাগন ছোরাটা কেড়ে নিল।

সে দীপককে ছোরা মারতে এগিয়ে এলো।

দীপক সঙ্গে সঙ্গে তার ছোরাসুদ্ধ হাতটা চেপে ধরল। তারপর মুচড়ে দিল।

ড্রাগনের হাত থেকে ছোরাটা জলে পড়ে গেল। সমুদ্রের তলায় তলিয়ে গেল সেটা।

দীপক অন্যমনস্ক ছিল। এমন সময় একটা হাঙরকে দেখা গেল তাদের দিকে তেড়ে আসতে।

দীপক ভয় পেয়ে উপরে উঠল।

কিন্তু ড্রাগন নীল সাগরের মাঝেই তার সমাধি ঘটল কি না।

ও. সি. দীপককে ওপরে তুলে ফেললেন। দীপক সবকথা বললে তাঁকে। তিনি বললেন—আশ্চর্য তো।

—সত্যিই তাই।

—ড্রাগন তা হলে কি জলের তলায় হাঙরের আক্রমণে মারা গেল।

দীপক হাসল।

—হাসলেন যে?

—হাসব না? ড্রাগন মরবার লোক নয়। নিশ্চয় পালিয়েছে।

—কোথায় পালাবে?

—জানি না। তবে হয়তো সে অনেক দূরে কোথাও গিয়ে উঠবে। ভবিষ্যতে আবার হয়ত দেখা হবে। কিন্তু সন্ধ্যা নেমে আসছে—আর তাকে পাওয়ার আশা নেই।

দীপক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মরণজয়ী ড্রাগন

।। এক।।

পর পর আঘাত

অঘ্রান না পড়েতেই এ-বছর শীত শুরু হয়ে গেছে! কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। শীতের বস্ত্র পরতে শুরু করছে সাধারণ মানুষ।

সেদিন সকাল।

দীপক ঘুম থেকে উঠে রতনকে সঙ্গে নিয়ে চা ও খাবার খেতে ব্যস্ত ছিল।

রতন বললে—এবারে অকালেই শীত পড়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি।

দীপক বললে—তা ত হবেই। যা বন্যা হয়েছে সারা দেশ জুড়ে, তাতে শীত ত অকালে পড়বেই।

—তা বটে। মনে হয় যেন উত্তর মেরুতে বাস করছি আমরা।

—তা ঠিক। দেখা যাক কত শীত পড়তে পারে।

রতন বললে—একটু আরাম করা যাবে ক'দিন।

দীপক বললে—আরাম! ও কথাটিকে একেবারে বাদ দাও ভাই।

—কেন?

—আরাম আমাদের ভাগ্যে লেখা নেই।

—তা ঠিক। ড্রাগন যে রকম ঘোড়দৌড় করাচ্ছে আমাদের, তাতে আরাম করার চিন্তা বৃথা!

—সত্যিই তাই। মনে হয়, যে-কোনও মুহূর্তে বুঝি প্রাণটাই গেল।

এমন সময়—হঠাৎ শোনা গেল একটা আর্ত চীৎকার!

দীপক ও রতন দু'জনেই চম্‌কে উঠল। দীপক রতনকে বললে—ব্যাপারটা কি বল ত?

রতন কিছু বলবার আগেই ঘরে প্রবেশ করল একজন লোক।

মাঝবয়সী ভদ্রলোক। চেহারা বিবর্ণ, পাণ্ডুর। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই সোফায় এলিয়ে পড়ল লোকটি।

তার পাণ্ডুর মুখে যেন মৃত্যুর ছায়া।

সোফায় এলিয়ে পড়েই জ্ঞান হারাল লোকটি।

দীপক বললে—ভীষণ ভয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে লোকটি।

রতন ছুটে গিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে এলো লোকটার চোখে-মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগল।

কিছুক্ষণ কাটল।

লোকটির জ্ঞান ফিরে এলো পরে ধীরে ধীরে। সে বললে ক্ষীণকণ্ঠে—আমি কোথায়?

—আমার বাড়িতে। দীপক বললে।

—ও, আপনিই দীপকবাবু?

—হ্যাঁ।

—নমস্কার।

—নমস্কার। কিন্তু এত ভয় পেলেন কেন বলুন ত'।

—আমাকে বাঁচান দীপকবাবু।

—কি হয়েছে?

—অমার সর্বনাশ হয়ে যাবার মত হয়েছে দীপকবাবু।

—তার মানে?

—আপনি ড্রাগনের নাম শুনেছেন?

—নিশ্চয়ই।

—দেখুন, সে আমার কি ভয়ানক সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে।

বলে লোকটি কাঁপতে কাঁপতে একটা চিঠি বের করে দীপককে দিল।

দীপক দেখল—

একটা কার্ড। তার কোণে একটা ড্রাগনের মূর্তি আঁকা।

তাতে লেখা ঃ

মহাশয়,

এই চিঠি হলো আমার পরোয়ানা। একে হেলা করবেন না। এটা পাওয়ামাত্র আপনার সিন্দুকে যে লক্ষ টাকার জড়োয়া গহণা আছে, সব আমার লোকের হাতে কাল তুলে দেবেন। তাকে পাবেন কাল বেলা দুটোর সময় দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ঘাটে।

আর যদি না দেন, তা হলে আমি আপনার সর্বনাশ করবো। ইতি—

দস্যু ড্রাগন।

—আমাকে বাঁচান দীপকবাবু। আপনার নাম শুনেছি অনেক। সেই ভরসাতেই এসেছি। আপনিই আমার একমাত্র ভরসা।

—আপনি কিছু ভাববেন না। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব, কেমন?

—ধন্যবাদ।

—আপনার নাম?

—বিনোদবিহারী সামন্ত।

—ঠিকানা?

—তের নম্বর গড়পার রোড।

—ঠিক আছে। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—ধন্যবাদ।

দীপক রতনের দিকে তাকাল। বললে—রতন, তুই যাবি ত সঙ্গে?

—নিশ্চয়।

—আরাম করবি না? ঠাট্টা করল দীপক।

—ঠাট্টা করছিস কেন? চল।

দু'জনে তৈরি হলো পোশাক পরে।

বাইরে বের হলো তিনজনে।

দীপক বললে—রতন, গাড়িটা বের কর।

—করছি।

গাড়ি বের করা হলো।

গাড়িতে চড়ল তিনজনে।

হঠাৎ যেন কিসের শব্দ শোনা গেল। দীপক কান খাড়া করে শব্দ শুনল। বললে—রতন গাড়ির জানালার আন্‌ব্রেকেবল কাঁচটা টেনে দে।

—ঠিক আছে।

রতন গাড়ির জানালা বন্ধ করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম! গুড়ুম্!

দু'বার পিস্তলের শব্দ হলো।

দীপক ও রতনও পিস্তল তুলল। কিন্তু গুলি ছোঁড়ার আগেই একটা কালো রঙের গাড়ি তাদের পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

দীপক বললে—দেখলি ত!

—হ্যাঁ।

—ভাগ্যিস্ সাবধান ছিলাম। তবু এই মোটা শক্ত কাঁচ ফেটে গেছে।

—তা ত যাবেই।

—যাক, ভয় নেই। চল, যাওয়া যাক।

—চল।

গাড়ি ছুটলো।

রতন জানালার পাশে পিস্তল উঁচিয়ে বসে রইল।

দীপক বললে—শত্রুরা আপনাকে ফলো করেছিল নিশ্চয় বিনোদবাবু।

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—তা ও-ব্যাটারা বুঝতে পেরেছে যে, অমরাও কম যাই না।

বিনোদবাবু কাঁপতে কাঁপতে বললেন—আপনি ছিলেন তাই রক্ষা—

—তা ত বটেই। কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন আপনি।

—সেকথা বলতে হবে না স্যার।

।। দুই ।।

ড্রাগনের ছোবল

বিনোদবিহারী সামন্ত যে খুব ধনী ও অভিজাত তা তাঁর বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায়।

গড়পার রোডে বিরাট প্রাসাদতুল্য তাঁর বাড়ি। এক কথায় তাকে শহরের লোক চেনে। বিখ্যাত ব্যবসায়ী।

যুদ্ধ আর মন্বন্তরের ফাঁকে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন করে ফেঁপেফুলে উঠেছেন। এখনও তাঁর আছে লোহার ব্যবসা—আর হীরা জহরতের কারবার।

বাড়ির সামনে লেখা—সামন্ত নিবাস। ধবধবে ঝক্‌ঝকে বিরাট বাড়িটা। বাড়িটায় ঢুকতেই দু'পাশে ছোট ছোট বাগান। তাতে আছে মৌসুমী ফুল, রজনীগন্ধা, আইভিলতার কুঞ্জ! মাঝখান দিয়ে ছোট ছোট পাথরকুচি বসানো পথ চলে গেছে। তার শেষে বারান্দার দু'পাশে ঘর।

সামনেই ড্রয়িংরুম। মিঃ সামন্ত দীপককে তাঁর ড্রয়িংরুমে বসালেন।

ভারী সুন্দর করে সাজানো ঘরখানি। দেখলেই ভদ্রলোকটির শৌখিনতার পরিচয় মেলে।

দীপক বললে—ভারি সুন্দর বাড়ি তো আপনার?

—হ্যাঁ। আমি চিরকালই একটু শৌখিন। এটা আমার সামান্য গরীবখানা—

দীপক হাসল। বলল—গরীবখানা হলে কি আর ড্রাগনের নজর এদিকে পড়ত? আর একটা কথা—

—বলুন?

—আপনার জহরগুলো একটু দেখব।

—তা ত বটেই।

—দেখতে হবে সেগুলো ঠিক সুরক্ষিত আছে কিনা। আর একটা কথা—

—কি বলছেন?

—পুলিশে এটা জানিয়েছেন?

—না ত!

—সে কি! শিগ্‌গীর লালবাজারে এ-বিষয়ে জানানো উচিত।

—কেন?

—পুলিশের সাহায্য ছাড়া এত সব জহরত সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা হবে কি করে?

—তা বটে।

—আপনার বাড়িতে ফোন আছে?

—তা আছে।

মিঃ সামন্ত একটা দেরাজ খুলে ফোনটা বের করে দিলেন।

দীপক রিসিভারটা তুলে নিয়ে ফোন করল মিঃ গুপ্তকে।

মিঃ গুপ্ত ফোন ধরলেন।

—হ্যালো, কে?

—আমি দীপক, কথা বলছি।

—কি ব্যাপার?

—ড্রাগনের ব্যাপার মিঃ গুপ্তা।

—ড্রাগন!

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

—এখানে একটা বাড়িতে ড্রাগনের খবর পাওয়া গেছে। সে সেখানে অভিযান চালাবে বলেছে।

—কোত্থেকে বলছেন?

—গড়পার থেকে। মিঃ বিনোদবিহারী সামন্তর বাড়ি থেকে বলছি।

—বুঝেছি।

—আপনি একবার এক্ষুণি চলে আসুন। সব কথা ফোনে বলা চলে না।

—ঠিক আছে। মিঃ গুপ্ত ফোন নামিয়ে রাখলেন।

মিঃ সামন্ত বললেন—একটু খাবার ও চা খেতে কি আপত্তি আছে?

—না, না, অনর্থক কেন—

—তা কি হয়! এই শীতে ধরে এনেছি আমি—আপনাদের কোন আপত্তি শুনব না। চা ও খাবার একটু খেতেই হবে।

বলতে বলতে ভদ্রোলোক ভেতরে চলে গেলেন এবং একটু পরেই বিবর্ণ মুখে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলেন।

দীপক বিস্মিত হলো। বললো—কি ব্যাপার?

—ড্রাগন!

—কোথায়?

—এই দেখুন! এটা ও ঘরে কুড়িয়ে পেলাম।

—তাই নাকি? দেখি।

দীপক মিঃ সামন্তর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে তা পড়তে লাগল।

তাতে লেখা ঃ

আপনি নিশ্চয়ই দীপকের সাহায্য নিয়েছেন। কোনও ফল হবে না। ড্রাগনের হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না আপনাকে। ওরা শুধু টাকা নেবে আর বসে বসে মজা দেখবে।

জহরতগুলো আমার চাই। তা না হলে আপনার ভয়ানক বিপদ জানবেন।

ইতি—

ড্রাগন

চিঠিটা পড়তে পড়তে দীপকের মুখে হাসি খেলে গেল।

সে বললে—এবারে দেখুন, ড্রাগনকে ধরে খাঁচায় পুরতে পারি কিনা।

রতন বললে—ব্যাটাকে আমি ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

দীপক হাসল।

—হাসলি কেন?

—তোর কথা শুনে।

—তার মানে?

—মানে অতি সহজ। বিচারে ড্রাগনকে শাস্তি দেবে। আমরা শুধু ধরে দিয়েই খালাস। তা হলে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবি কি করে?

—তা বটে।

রতন লজ্জা পেল।

এমন সময় চা খাবার এলো। উড়ে বামুনটা চা ও খাবার হাতে ঢুকল।

রতন ও দীপক খেতে লাগল। দীপক বললে—তা লোকটা রান্না করে ভাল।

—ঠিক কথা।

চা-খাবার শেষ হলো।

এমন সময় একটা গাড়ি দাঁড়াল ঠিক বাড়ির সামনে।

গাড়ি থেকে নামলেন মিঃ গুপ্ত, তিনি দৃঢ়পায়ে ঢুকলেন ভেতরে।

—আসুন মিঃ গুপ্ত। নমস্কার।

—নমস্কার। তা হঠাৎ এঁর বাড়িতে—

—ব্যাপার আছে।

—ব্যাপারটা কি? জরুরী তলব একেবারে আমাকেই।

দীপক সব কথা বললে।

মিঃ গুপ্ত বললেন—তা বাড়িতে কত টাকার জুয়েলারী ও গহনা আছে?

—মোট দু-তিন লাখ টাকার মতো।

—সর্বনাশ!

—কেন?

—এত টাকার মাল বাড়িতে রাখেন কেন? ব্যাঙ্কে রাখতে পারেন না?

—তা হয় না মিঃ গুপ্ত।

—কেন?

—জানেন না, এটা আমার ব্যবসা। মাল কেনা-বেচা করি আমি। তাই ব্যাঙ্কে রাখলে চলবে কেন?

—তা বটে। এখন বুঝুন ঠ্যালা।

দীপক বললে—যাক, জিনিসগুলো সব একবার দেখি।

—আসুন। সব দেখাচ্ছি আমি।

—তা ত দেখাতে হবেই। কিন্তু—বলে মিঃ গুপ্ত থামলেন।

—কিন্তু কি?

—এখন গহনা না দেখে প্রকৃত সূত্র বের করা উচিত।

—তা বটে। তবে কিভাবে ওগুলো আছে, তা না দেখলে সূত্র বের হবে কি করে?

—ভাল, প্রস্তাব।

—হ্যাঁ। অযথা দেরী করে লাভ নেই।

মিঃ সামন্ত বললেন—আসুন।

।। তিন ।।

গোলক ধাঁধার পথে

মিঃ সামন্ত দীপক, রতন ও মিঃ গুপ্তকে নিয়ে চললেন একটার পর একটা ঘরে।

অবশেষে একটা ঘরে একটা গুপ্ত কুঠুরী পাওয়া গেল। তার সামনে একটা বিরাট অয়েল-পেন্টিং ছবি। ছবির পেছনে সুড়ঙ্গপথ।

এই ছোট্ট ঘরে অয়েল-পেন্টিং-এর পেছনে এমন একটা সুড়ঙ্গের কথা কল্পনা করাই কঠিন। সকলে অবাক।

মিঃ সামন্ত বললেন—আসুন।

—ভেতরে?

—হ্যাঁ।

ভেতরের সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল ওরা। সবার পেছনে চলল দীপক।

বিশেষ কায়দায় একটা দরজা খুললেন মিঃ সামন্ত সিঁড়ির শেষে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সকলে।

মিঃ সামন্ত তারপর একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন।

ছোট্ট সুন্দর ঘর।

কোণে একটা লোহার গোদরেজ আলমারী। তাতে তালা।

তালা খুললেন তিনি কৌশল।

তারপর একটা সেফ খুলতে তার মধ্যে দেখা গেল ঝক্‌ঝক করছে গহনা, জহরত ইত্যাদি।

সবাই বিস্মিত।

আজ এগুলোর দাম দু'তিন লাখ টাকার কম নয় কিছুতেই।

দীপক হঠাৎ ঠেলে সেফ বন্ধ করল।

মিঃ সামন্ত অবাক!

দীপক ছিল সবার পেছনে।

সে হঠাৎ পিস্তলটা উদ্যত করে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে লাগল।

দ্রুতগতিতে সিঁড়িগুলো পার হয়ে ওপরের দিকে ছুটল পিস্তল উদ্যত করে।

কেউ কিছু বুঝতে পারল না, সকলে অবাক। তারা চেয়ে দেখতে লাগল শুধু—কি ব্যাপার!

একটু পরে। মিঃ সামন্ত, রতন ও মিঃ গুপ্ত দরজা বন্ধ করে উঠে এলেন।

এসে দেখেন সিঁড়ির শেষে গুপ্ত কক্ষের মেঝেতে দীপক একজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে হাঁপাচ্ছে।

তার পাশে পড়ে আছে একটা ছোরা। সকলে অবাক ।

মিঃ সামন্ত বললেন—একি করলেন!

—কেন?

—একে চেনেন?

—এ ড্রাগনের লোক।

—সেকি? এ যে আমার চাকর রামু।

—রামু নয়।

—তার মানে?

—এ রামুর ছদ্মবেশে এখানে আছে।

—সে কি ব্যাপার!

—হ্যাঁ। এর প্রকৃত পরিচয় জানতে চান?

—নিশ্চয়।

—দেখুন।

দীপক লোকটির গোঁফ-দাড়ি ধরে টান দিল সজোরে।

সবগুলো খুলে গেল।

মাথার পাগড়িটাও খুলে ফেলল দীপক। বললে—এবার দেখুন।

সকলে তাকাল।

দেখল বীভৎস একটা মুখ ঐ লোকটার। তারা অবাক হলো।

মিঃ গুপ্ত বললেন—কি ব্যাপার?

দীপক লোকটার ডান হাতের জামাটা তুলে ফেলল। দেখা গেল, উল্কি দিয়ে লেখা ১২ নম্বর।

দীপক বললে—এ লোকটি ড্রাগনের দলের ১২ নম্বর লোক।

মিঃ সামন্ত বললেন—রামু কোথায়?

—বোধ হয় এ তাকে লুকিয়ে রেখেছে।

—সে কি!

দীপক বললে—কি হে, বলবে নাকি, রামু কোথায় আছে?

—জানি না।

—তবে ইলেকট্রিক শক্ লাগাতে হবে। ভাল রকম দাওয়াই চাই।

লোকটা ভয় পেলো।

বললে—রান্না ঘরে চৌকির নিচে আসল রামু অজ্ঞান হয়ে আছে।

—তাই বল।

রামুকে মুক্ত করে আনা হলো। দীপক একটা ঔষধ শুঁকিয়ে তার জ্ঞান সঞ্চার করল।

মিঃ গুপ্ত বললেন—আপনি কি করে জানলেন এর কথা?

দীপক বললে—আমার প্রথম থেকেই কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল একে। এর চোখ দুটো চক্‌চক্ করছিল। আর ও বড় ঘুরঘুর করছিল ও-ঘরে।

—তারপর?

—তারপর আমি বলালম—গহনা দেখতে হবে। তা শুনে ওর চোখ দুটো জ্বলে উঠল—সব আমি লক্ষ্য করি। আমরা যখন গহনা দেখতে যাই, একে রাখি সবার পেছনে।

—কেন?

—কারণ আমি সন্দেহ করি ও নিশ্চিত আমাদের পিছু নেবে। তারপর দেখি ও ঠিক পিছু নিয়েছে। আমরা যখন ঘরে গহনা দেখছি, ও ব্যাটা তখন সিঁড়ি দিয়ে

নেমে উঁকি দিচ্ছিল গুপ্তকক্ষে। তাই আমি ছুটে আসি। আমাকে দেখে ও দৌড়ে পালাতে যায়। এ-ঘরে এসে ওকে ধরতে যেতেই ও একটা বড় ছোরা বের করে। তবে ব্যাটা জানে না যে, আমার জুজুৎসুর প্যাঁচের কাছে ওর ছোরা কিছুই নয়।

—ঠিক কথা।

ছোরাটার দিকে তাকিয়ে মিঃ সামন্ত বললেন—উঃ, কি বিরাট ছোরা।

দীপক হাসল।

বললে—ড্রাগনের দল এমনি ছোরাই ব্যবহার করে থাকে।

—তা বটে।

—তবে দীপক চ্যাটার্জী যে ছোরার ভয় করে না, তা ড্রাগনের জানা উচিত ছিল।

দীপক তারপর বললে—মিঃ গুপ্ত, আপনার জীপ বাইরে আছে তো?

—তা আছে।

—ওতে তো একজন কনষ্টেবল আছে। তাই না?

—হ্যাঁ।

—ও ব্যাটাকে তা হলে জীপে করে থানায় নিয়ে যান।

মিঃ গুপ্ত বললেন—উঃ, ড্রাগনের দলের আরও লোক ছদ্মবেশে আছে কি না, কে জানে?

দীপক বললে—মনে হয় আছে।

—কোথায়?

—রাস্তার মোড়ে একটিকে দেখেছিলাম। তবে ও যখন ধরা পড়ল, সেও বোধ হয় পালিয়ে যাবে নিশ্চয়।

—তা ঠিক।

দীপক বাইরে এলো।

সত্যিই তাই। বাইরের পথে যে একটা ছদ্মবেশী লোক ঘোরাফেরা করছিল, তাকে আর দেখা গেল না।

দীপক বললে—দেখলেন তো, ব্যাটারা সব ঘুঘু। ঠিক পালিয়েছে।

—তা বটে।

মিঃ গুপ্তকে বললেন চিন্তিতভাবে।

মিঃ সামন্ত বললেন—আচ্ছা, আমার ব্যবস্থা কি হবে?

দীপক বললেন—সে ত করবোই আমরা। মিথ্যা ভয় পাবেন না।

।। চার।।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা

দীপক তারপর মিঃ সামন্তের দিকে চেয়ে বললে—একটা কথা মিঃ সামন্ত।

—কি?

—আমি ভাল করে প্রতিটি চাকর, ঠাকুর, দরোয়ান ইত্যাদিকে জেরা করতে চাই।

—কেন?

—মনে হয় এদেরও মধ্যেও ড্রাগনের চর থাকা বিচিত্র নয়।

মিঃ গুপ্ত বললেন—ঠিক কথা।

—তা হলে তাদের ডাকুন।

—বেশ।

মিঃ সামন্ত প্রত্যেককে ডেকে পাঠালেন।

বাড়িতে দু'জন চাকর, একজন দারোয়ান, একজন মালী, একজন ঠাকুর আর ড্রাইভার। মোট ছয়জন লোক। প্রত্যেককে ডাকলেন মিঃ সামন্ত।

তারা এসে গেল।

মিঃ গুপ্ত বললেন—তোমরা কেউ বেইমানি করবে না তো?

—কেন হুজুর?

—দস্যু হয়ত তোমাদের কাউকে হাত করতে পারে। বেইমানকে থানায় পুরব।

তারা সবাই ভয় পেয়ে গেল। হাউ মাউ করে তারা কাঁদতে লাগল। মিঃ গুপ্তের পা জড়িয়ে ধরল তারা একসঙ্গে।

মিঃ গুপ্ত বললেন—একটা সত্যি কথা বলবে?

—বলুন বাবু?

—তোমরা কিছু জানো না?

—না বাবু।

—সব বুঝি ন্যাকা?

—সত্যি বলছি বাবু। আমরা কিছুই জানি না ঐ ডাকাত-টাকাতের ব্যাপারে।

—ঠিক বলছ?

—ঠিক বাবু। বিশ্বাস করুন।

দীপক ভাল করে প্রত্যেককে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বললে—না, মিঃ গুপ্ত! এরা কেউ ড্রাগনের লোক নয়।

—ঠিক ত?

—নিশ্চয়।

—তবে ছেড়ে দিন।

—তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সবাই দৌড়ে পালিয়ে গেল ভেতরে।

মিঃ গুপ্ত বললেন—এবার কি কর্তব্য?

—দু-তিনজন পুলিশকে বাড়ির সামনে পাহারায় বসিয়ে দিন।

—তা ত দেব। কিন্তু ক'দিন চলবে?

—অন্ততঃ সাতদিন কি তারও বেশি।

—ভয় নেই ত আর তারপর?

—না মনে হয়। যদি ড্রাগন কিছু করতে চেষ্টা করে এর মধ্যেই করবে।

—তা বটে।

তখুনি মিঃ গুপ্ত ফোন করে দিলেন সোজা লালবাজারে।

একজন অফিসার বললেন—ঠিক আছে স্যার, আমি চারজনকে পাঠাচ্ছি।

—আচ্ছা।

একটু পরেই বাড়ির সামনে পাহারা বসিয়ে দিলেন মিঃ গুপ্ত।

মিঃ সামন্ত একটু ভরসা পেলেন।

মিঃ গুপ্ত ও দীপক বিদায় নিল।

—আনমনে একটা পথ দিয়ে হেঁটে চলেছিল দীপক একা।

ভাবছিল ড্রাগনের কথা।

সত্যি, তাদের সব সময় প্রাণ হাতে করে চলতে হয় পথে।

রতন ও মিঃ গুপ্ত প্রায়ই বলেন এ কথা।

ভাবতে ভাবতে শহরের একটা কুখ্যাত অঞ্চলে এসে যায় দীপক।

সারি সারি সব বস্তি তার মধ্যে পায়রার খুপরির মত সব ঘর।

সরু সরু পথ! এত সরু যে দু'জন লোক বোধ হয় পাশাপাশি চলতে পারে না। দিনের বেলায় ওপথে চলতে ভয় হয়—আর এ হলো রাত।

তবু ভয় নেই দীপকের।

ঘড়িটা দেখে সে। রাত সাড়ে নটা বেজে গেছে ঘড়িতে।

একটা সরু গলির শেষে একটা ঘর। দীপক ঘরের কড়া নাড়ে।

—কে?

—দরজা খোল একবার।

-আপনি?

—দীপকবাবু।

—আচ্ছা বাবু।

দরজা খুলে যায়। একটি হৃষ্টপুষ্ট লোক বেরিয়ে আসে।

দীপক এর উপকার করেছে জীবনে অনেক। তাই ও গুণ্ডা হলেও দীপকের বহু

কাজে সাহায্য করে। দীপকও ওকে টাকা দেয় মাঝে মাঝে।

—কি মনে ক'রে হুজুর?

—একটু কাজ আছে।

—বলুন। আমি সব সময় তৈরি।

—তা জানি । শোন বলি, রাত দশটায় যেতে হবে খিদিরপুর তিন নম্বর ডকে।

—কেন?

—গোপন খবর পেয়েছি যে, ওখান দিয়ে ড্রাগন মাল পাচার করছে জাহাজ থেকে।

—রোজ?

—না, মাঝে মাঝে। কাল বোধহয় সে চেষ্টা করবে।

—ঠিক আছে।

—যদি ধরতে পার ওদের লোককে বা স্বয়ং কর্তাকে, তবে মোটা বক্‌শিস পাবে। অবশ্য আমিও থাকবো গোপনে।

—আচ্ছা।

এই নাও নগদ একশো আগাম।

—বহুৎ আচ্ছা।

—ড্রাগনের নাম শুনে ভয় পাওনি ত ওসমান?

—না বাবু। জানি লোকটা সাক্ষাৎ শয়তান, তবু ভয় পেলে কি চলে? আমাদের সব সময় জীবন হাতে নিয়ে কাজ করতে হয় জানেন ত?

—তা বটে।

—দুশমনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যেদিন ভয় পাব তার আগে গোর দিয়ে দিবেন বাবু।

—বহুৎ আচ্ছা।

দীপক পথে নামে।

নানা চিন্তা তখন তার মনে খেলা করতে থাকে।

ধীরে ধীরে দীপক এগিয়ে চলে।

।। পাঁচ ।।

নতুন শেঠজী

দীপক ওসমানের কাছে বিদায় নিয়ে ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফিরল। তখন রাত দশটা। দীপককে দেখে ভজহরি বেরিয়ে এলো। বললে—একটা কথা।

—বল।

—ঘণ্টাখানেক আগে একজন বাবু দেখা করতে এসেছিলেন।

—তারপর?

—আপনার জন্যে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে না পেয়ে, একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, দেখুন টেবিলের উপর ঐ বইটার মধ্যে আছে।

—দেখছি।

দীপক চিঠিটা বের করে পড়তে শুরু করে দেয়। তাতে লেখা।

দীপকবাবু,

আমি জানি আপনি একজন ভাল গোয়েন্দা। কিন্তু এত অপরাধী থাকতে বারবার আমার পিছনে লাগাই যেন আপনার ব্রত। কেন আপনার এই অপপ্রয়াস? আমার অনুরোধ, আপনি এমন একজনকে নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামাবেন না। মিথ্যা বিপদ ডেকে আনছেন কেন? ইতি—

ড্রাগন

চিঠিটা পড়ে দীপক মনে মনে হাসে। ড্রাগন জানে সে তার পিছু ছাড়বে না। তবু সে বারবার সাবধান করে কেন? এটা আর কিছু নয়। ড্রাগনের আত্মপ্রশংসা লাভের একটা পথ মাত্র।

সে যে দীপকের নাকের ডগায় এসেছিল তাই প্রমাণ করতে চায় এই চিঠিটা দিয়ে।

দীপক মনে মনে খুশী হয়। সে অন্ততঃ সারা ভারতে একজনকে ভয় করে।

পরদিন সকাল।

দীপক একজন বিখ্যাত জুয়েলার শেঠ হীরালাল সরাওগীর পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করল।

দীপকের মেকআপ এত নিখুঁত হলো যে, যে কেউ তাকে দেখলে শেঠ হীরালাল সরাওগীই মনে করবে।

দীপক তারপর দামী হীরা মুক্তার বৃহত্তম ব্যবসায়ী শেঠ লছমনদাসের দোকানে এসে হাজির হলো।

দীপক নিজের গাড়ি নেয় নি, কারণ তা হলে ধরা পড়ার ভয়। সে একটা ট্যাক্সিতে চেপে এখানে এলো।

দীপক গাড়ি থেকে নেমে পেছনে দেখে নিল ভাল করে। না, কেউ তাকে অনুসরণ করতে পারেনি।

দীপক দোকানে ঢুকল। দোকানে অগণিত লোক কাজ করছে।

দীপক ভেতরে ঢুকতেই ম্যানেজার স্বয়ং এলেন এগিয়ে।

—এই যে, কি সৌভাগ্য! শেঠজী স্বয়ং—

—হ্যাঁ। আপনি কেমন আছেন?

—আপনার আশীর্বাদে ভাল—আপনার মত গ্রাহক আছেন বলেই ত চলে যাচ্ছে কোনও রকমে।

—আমার মত গ্রাহক। আরও কত বড় বড় গ্রাহক আছে।

—আরও বড় বড়?

—হ্যাঁ। শুনেছি নতুন একজন খুব ধনী লোক আসে মাঝে মাঝে।

ম্যানেজার হাসলেন। বললেন—আপনি দেখছি সব খবর রাখেন।

—তা রাখতে হয় নিশ্চয়ই।

—তবে শুনুন। সে মাঝে মাঝে মাল কেনাবেচা করে বটে, তবে নিয়মিত নয়। আর সে বেচে বেশি, কেনে কম।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তিনিও কি আমাদের স্বজাতি নাকি?

—না, না—

—তবে?

—তিনি বাঙালী।

—বাঙালী! তবে আর কিনবে কি? তা তার নাম জানেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনোমোহন বাবু।

—আমিও ঐ নাম শুনেছি। আমাকে দেখা করতে বলেছিল লোকটা।

—তাই নাকি?

—যাক, এবারে ভাল কিছু মাল দেখান।

মাল দেখালেন ম্যানেজার। দীপক ক'টা মাল পছন্দ করল। দাম মোট হাজার বিশ টাকা হবে।

দীপক বললে—এগুলো আমি কাল এসে নিয়ে যাব। আজ চেকবই আনিনি।

—ঠিক আছে।

দীপক তারপর ডায়েরীটা খুলে কি যেন দেখতে দেখতে বললে—উঃ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে ত।

—কি ভুল হলো?

—মনোমোহনবাবুর ঠিকানা লেখা ছিল—সেটা হারিয়ে ফেলেছি। আজই দেখা করার কথা ছিল তার সঙ্গে।

—তাতে কি? ঠিকানা আমাদের খাতায় লেখা আছে।

—তবে ত ঠিক আছে।

—তিনি কাউকে ঠিকানা দিতে বারণ করেছেন—তবে আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনি হলেন গিয়ে ঘরের লোক।

—তা ত বটেই।

ম্যানেজার ঠিকানা দিলেন—২৬/৩, প্রিন্সেপ স্ট্রীট।

দীপক ঠিকানাটা লিখে নিল। তারপর নমস্কার জানিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো।

।। ছয়।।

সর্বনাশ সাধন

দীপক বাড়ি ছিল না।

রতন নিজের মনেই বসে বসে ঐ ড্রাগনের বিষয়ে নানা কথা ভাবছিল।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। মিঃ সামন্ত আর্জেন্ট যেতে বললেন ফোনে।

কি ব্যাপার? রতন চিন্তিত হলো খুব।

পথে নেমে পড়ল মেকআপ করে।

পথে নেমে চারিদিকে তাকাল।

দূরে একটা দোকানের মোড়ে একজন ভিখারী বসে প্রতীক্ষা করছিল যেন কারও জন্যে। রতন ভাবল, হয়ত সে ড্রাগনের কোনও এক অনুচর।

কিন্তু এগিয়ে এসে দেখে সেই ভিখারীটা নেই।

কোথায় অদৃশ্য হলো তা কে জানে? রতন চিন্তিত হলো।

এগিয়ে এসে দেখতে পেল একটা ভাঁজ করা কাগজ পড়ে আছে।

তাতে লেখা ঃ

ওহে ছোট টিকটিকি,

যতোই ছদ্মবেশে তুমি ঘোরাফেরা কর [illegible]ন, আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি ঠিক তোমাকে চিনতে [illegible]রেছি। তোমার ক্ষতি আমি [illegible]রতে পা[illegible] যে-কোন মুহূর্তে, তা ভুলো না। ইতি—

ড্রাগ[illegible]

রতন বুঝতে পারে ড্রাগন নিজের বাহাদুরী প্রচার করবার জন্যে [illegible]ঠি [illegible]য়েছে।

সে নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে আসে। ড্রাগনকে ভয় পেলে কাজ করা যাবে না, তা সে বুঝতে পারে।

রতন তখন একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলল তার নিজের গন্তব্যপথে।

গাড়ি ছুটে চলেছিল। এমন সময় ঘটল একটা দুর্ঘটনা।

একটা কালো গাড়ি কোত্থেকে এসে হঠাৎ গাড়ির গতিপথে হাজির হলো।

রতনের গাড়ির ড্রাইভার আচমকা এভাবে বাধা পেয়ে গতিটা না কমিয়ে পূর্ণগতিতে বোঁ করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

এত জোরে গাড়িটা পাশ কাটিয়ে চলতে গিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল।

রতনের দেহটা যেন লাফিয়ে উঠল।

সে কালো গাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে, তার মধ্যে বসে এক অদ্ভুত মূর্তি। চোখে তার ক্রুর দৃষ্টি।

রতন বুঝতে পারে, এই বোধহয় ড্রাগনের দলের দলপতি।

রতনের গাড়ি পাশ কাটিয়ে ছুটে চলল বটে, তার মনটা যেন ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। একটা দুঃস্বপ্নের মূর্তি যেন তার মনের মধ্যে বিরাজ করতে লাগল।

নির্দিষ্ট সময়ে রতন এসে উপস্থিত হল মিঃ সামন্তের বাড়িতে।

মিঃ সামন্ত রতনকে দেখে যেন বিস্তিত ভাবে বললেন—সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—তার মানে?

—মানে ড্রাগনের দলের কেউ, বা সে নিজে এসে গহনাগুলো সব চুরি করে নিয়ে গেছে।

—কবে?

—আজই।

—সেকি! বাইরে বন্দুকধারী পুলিশ পাহারা ছিল না?

—তা ছিল। তবে অদ্ভুত উপায়ে ড্রাগন তার কাজ শেষ করেছে।

—কি ভাবে?

—আমি বেলা ন'টার সময় একটু দোকানে গেছিলাম। বাড়িতে বলে গেছিলাম যে, এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টার মধ্যে ফিরব।

—তারপর?

—আমি বাইরে বেরিয়ে যাবার ঠিক মিনিট দশেক পরেই আমার মত চেহারার একজন লোক এসে উপস্থিত।

আমার চাকর হলধর তাকে প্রশ্ন করে, একি বাবু, আপনি?

—হ্যাঁ, যে কাজে যাচ্ছিলাম, সেখানে না গিয়ে আবার ফিরে এলাম।

—কেন?

ভাবলাম গহনাগুলো বাড়িতে রাখা ঠিক নিরাপদ নয়।

—তবে কি করবেন?

—সব নিয়ে গিয়ে ব্যাংকের সেফ্ ভল্টে রেখে দেব আমি।

—তা ভাল। কিন্তু—

—কিন্তু কি আবার?

—পথের মধ্যে যদি ওরা কিছু করে?

—কিছু করতে পারবে না। আমি নিজে গাড়িতে করে নিয়ে যাব সোজা ব্যাংকে।

—তা ভাল।

—লোকটা আশ্চর্যভাবে ঘরের চাবি খুলে ফেলে। বোধ হয় কোনও নকল চাবি আগে থাকতে তৈরি করে রেখেছিল।

রতন বাধা দিয়ে বলে—তা নয় মিঃ সামন্ত।

—তবে?

—সব-খোলা চাবি পাওয়া যায়—তার গোছা সঙ্গে থাকলে সব রকম তালা খোলা যায়।

—তা হতে পারে। যা হোক, লোকটা তালা খুলে সব গহনা বের করে আনে।

—তারপর?

—তারপর এঘরে এনে একটা বাক্সে সব গহনা ভরে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

হলধর প্রশ্ন করে—কখন ফিরবেন?

লোকটা বলে—বড়জোর এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব।

লোকটা বেরিয়ে এসে একটা গাড়িতে চেপে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি ফিরে এসে সব জানতে পারি।

রতনের মুখ দিয়ে শুধু বের হয় একটা কথা—আশ্চর্য কাণ্ডই বটে।

।। সাত।।

সূত্রের পথে

মিঃ সামন্তর কাছে সব শুনল রতন। তার মন ব্যথায় ভরে উঠল।

সত্যি, আজীবন তিল তিল করে সঞ্চয় করা অর্থ নিয়ে ড্রাগন পালিয়ে গেল।

রতন বললে—চলুন, ঘরগুলো দেখব।

—চলুন।

রতন গিয়ে প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে দেখল যদি কোনও সূত্র মেলে কিন্তু কোন ও সূত্র পেল না সে।

হতাশ হয়ে সুড়ঙ্গের শেষে যে ঘরে সিন্দুক ছিল সেই ঘরে গেল।

সেখানে গিয়ে সে হঠাৎ একটা জিনিস দেখতে পেল। রতনের মনটা আনন্দে ভরে উঠল।

যেখানে সিন্দুকটা ছিল তার পাশেই পড়েছিল একটা কার্ড।

বোধ হয় অসাবধানে তা ড্রাগনের পকেট থেকে পড়ে গেছে।

রতন কার্ডটা দেখল, তাতে লেখা—

প্রিয় বাসু,

তুমি আজ রাত আটটা নাগাদ আমার সঙ্গে ২৬/৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীটে দেখা করবে। ইতি—

ড্রাগন

রতন সেটা পকেটে রাখল।

রতন গিয়ে সামন্তকে বলল—কোন ও ভয় নেই মিঃ সামন্ত। ড্রাগনকে এবারে খাঁচায় পুরব।

—কি করে?

—সে দেখতেই পাবেন।

—সত্যি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

রতন বাইরে বেরিয়ে এলো।

গভীর রাত।

সারাটা কোলকাতা শহর যেন ঠিক মৃতের মত নিস্তব্ধ নিঝুম।

পথ জনহীন।

শুধু গঙ্গার বুকে ছোট ও বড় সব স্টিমার আর জাহাজ। তাদের বুকে মিট্‌মিট্ করে আলোর মালা জ্বলছে।

তার মধ্যে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, একজন পাগল ডকের ঠিক নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। আপন মনে সে কি যেন বলছে।

একজন সিপাই এলো এগিয়ে।

—এই, কি চাই?

—কেয়া করতা হ্যায়?

—রোটি খাতা আর নাচনা গানা চালাতা।

পুলিশ বুঝল লোকটা পাগল। সে কিছু না বলে চলে গেল।

কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যেত, ও লোকটা আমাদের আগে দেখা ওসমান ছাড়া কেউ নয়।

এমন সময়।

দু'জন লোককে দেখা গেল ঠিক ঐ সময় ডকে আসছে।
দু'জনের পরনে কালো পোশাক। মুখের অনেকটা অংশ ঢাকা।
দু'জনে পাগলটিকে দেখল।
একজন থেমে বললে—শালা পাগল।
—তা বটে।
দু'জনে ডকে উঠে এগিয়ে গেল। তারপর দু'বার শিস দিল।
একজন নাবিক শ্রেণীর লোক এগিয়ে এলো ধীর পায়ে।
—কে?
—সাত নম্বর আর তিন নম্বর।
—তোমরা সময় মত এসেছ ত?
—হ্যাঁ।
—টাকা এনেছ?
—এনেছি।
—মাল রেডি।
—কতটা?
—যা বলা ছিল।
—তোমার কথার সত্যিই দাম আছে পিটার সাহেব।
—তা বটে। আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না জেনো।
—ঠিক কথা। তুমি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির দেখছি।
—যাক্‌গে। এই যে মাল।
পিটার নামধারী নাবিকটা একটা বড় প্যাকেট তুলে দিলে লোক দু'টির হাতে
তারা তা নিয়ে টাকাটা দিল।
—কত আছে?
—এক হাজার।
—আর দুশো?
—পরের বারে পাবে।
—বাকীতে কাজ আমি করি না জেনে রেখো। মাল নগদ, টাকাও নগদ।
—বেশ এই নাও।
বাকী দুশো টাকাও তারা দিল।
পিটার অন্ধকারে অদৃশ্য হলো।
লোক দু'জন এগিয়ে চলল।
কিন্তু ওসমান পাগলের ছদ্মবেশে ওদের উপরে ঠিকই নজর রেখেছিল।
লোক দুটো এগিয়ে আসতেই তাদের আক্রমণ করল।

তারাও তৈরি ছিল।

একজন ছোরা বের করল। ওসমানও জীবনের পরোয়া করে না। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোরাটা কেড়ে নিতে গেল।

সেটা পড়ে গেল গঙ্গায়।

তারপর দু'জনে মল্লযুদ্ধ শুরু করল। লোকটা ওসমানের অসুরের মত শক্তির সঙ্গে পেরে উঠল না।

সে হার মানল।

তাকে প্রচণ্ড আঘাত করে ওসমান যখন দ্বিতীয় লোকটাকে ধরতে গেল, তখন সেও ছোরা বের করল। ওসমান ক্লান্ত। তার দেহে ছোরা বিদ্ধ করতে গেল লোকটা।

সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল গর্জে উঠল—গুড়ুম!

ওসমান দেখে সামনে দীপক। দীপক লোক দুটোকে বেঁধে থানায় চালান করিয়ে দিল।

তারপর বললে—সাবাস ওসমান!

—কিন্তু আপনি না এলে আমার জীবন শেষ হয়ে যেত।

—ভগবান রক্ষাকর্তা, আমি কে? দীপক বলল—এরাই হলো ড্রাগনের দু'জন নামকরা অনুচর।

—তাকি নাকি?

—হ্যাঁ। ওদের ধরলাম। এতে ড্রাগন দুর্বল হয়ে পড়বে।

ওসমান কোনও উত্তর দিল না।

।। আট।।

আবার হত্যার চেষ্টা

দীপক সেখান থেকে বাড়ি ফিরে এলো নিশ্চিন্ত মনে।

ড্রাগনকে ধরার পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে, তাই মন তার প্রফুল্ল।

বাড়িতে ফিরেই সে ভজহরিকে প্রশ্ন করলে—রতন এসেছিল?

—হ্যাঁ।

—কতক্ষণ?

—কিছুক্ষণ আগে।

—তারপর?

—তারপর হঠাৎ তিনি একটা চিঠি লিখে রেখে বেরিয়ে গেলেন।

—চিঠি?

—হ্যাঁ।

—কই দেখি?

দীপক দেখল রতন তার প্যাডে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে।

দীপক পড়ল।

রতন লিখেছে—

প্রিয় দীপক,

মিঃ সামন্তের সর্বস্ব অপহৃত হয়েছে। তুই হয়ত সব জানিস। আমি একটা সূত্র পেয়েছি, ড্রাগনের একটা নতুন আড্ডার ঠিকানা—ঠিকানাটা ২৬/৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট।

বিশেষ সূত্রে জানতে পেরেছি যে, ড্রাগন ঐ বাড়িতে থাকে।

ড্রাগনের গন্ধ পেয়ে আমি ঠিক থাকতে পারি না। তাই যাচ্ছি তার সন্ধানে।

জানি এ পথে বিপদ আছে। তবে আমি তা গ্রাহ্য করি না। ড্রাগনের খবর নিতেই হবে আমাকে।

তাই আমি চললাম। তুই ফিরে এসে খোঁজ নিস্।

ভালবাসা রইল। ইতি—

রতন

চিঠিটা পড়ে দীপক চিন্তিত হলো।

রতন একা গেছে ড্রাগনের দলের পেছনে—সেটা গভীর চিন্তার কথা সন্দেহ নেই। দীপক ভাবতে লাগল, কি করা যায়?

২৬/৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট ত বিখ্যাত ধনী মনোমোহনবাবুর ঠিকানা। সেখানে কি ড্রাগন আবার এসেছিল?

তা নয়। রতন কাজ ভালবাসে তাই সূত্রটা পেয়েই ছুটেছে।

দীপক চিন্তা করতে লাগল। তারপর সেও বেশভূষা পরে তৈরী হয়ে নিল।

এক্ষুণি সে বের হবে অনুসন্ধানের চেষ্টায়। দেখা যাক, কি হয়।

এমন সময়।

ঘন ঘন ফোন বেজে উঠল।

দীপক রিসিভার তুলল।

—হ্যালো, কে?

—মিঃ গুপ্ত স্পিকিং।

—কি ব্যাপার?

—সর্বনাশ দীপকবাবু। ড্রাগনের অনুচর দুটি পালিয়েছে।

—কি করে?

—আমরা ত তাদের পুলিশ ভ্যানে তুলে দিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ।

—পথে আসতে আসতে হঠাৎ একটা মোড়ে পুলিশ ভ্যানে বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

—হাত বোমা?

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—তারপর পুলিশ ভ্যানটার দরজা ভেঙে গেল। চারজন দস্যু পিস্তল দেখিয়ে লোক দুটিকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

—রাত দশটায় এই কাণ্ড?

—হ্যাঁ।

—ওঃ! আপনারা আর কিছু করতে পারলেন না?

—সত্যিই—বিশ্রী কাণ্ড।

—যদি আমার হাত থেকে থানায় আনতে না পারেন তবে কি করে আপনি তাকে ধরবেন?

—তা বটে।

চিন্তিত ভাবে দীপক রিসিভার নামিয়ে রেখে দিল।

।। নয়।।

বাঘের গুহায়

রতন মিঃ সামন্তের বাড়ি থেকে সোজা চলে গেল একটা কুখ্যাত বার ও হোটেলে।

সেখানে একটা টেবিলে চুপচাপ বসে সে খাবার খেতে লাগল।

তার পোশাক সে ট্যাক্সিতে পাল্টে নিয়েছিল। এবারে তাকে দেখাচ্ছিল একজন কাবুলির মত। মাথায় পাগড়ি, পরনে সালোয়ার, গায়ে লম্বা পাঞ্জাবী, মুখে ছোট করে ছাঁটা দাড়ি ও গোঁফ।

সে চুপচাপ বসে খাবার খেতে খেতে উল্টো দিকের টেবিলে বসে থাকা তিনটি লোকের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিল।

রাত যখন প্রায় একটা, তখন ওরা তিনজনে উঠে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

রতন উঠে ওদের থেকে খানিকটা দুরত্ব বজায় রেখে চলতে শুরু করল।

ওরা বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল। রতনও সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি নিল। দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করে চলল আগের গাড়িকে।

সামনের ট্যাক্সিটা এঁকে বেঁকে অনেকটা পথ ঘুরে শেষে প্রিন্সেপ স্ট্রীটে একটা পোড়ো বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

বহুদিনের পুরোনো বাড়িটা দেখতে ঠিক যেন একটা ভুতুড়ে বাড়ি মনে হয়। সব ইটগুলো যেন দাঁত বের করে আছে। মাঝে মাঝে সব জংলা গাছ গজিয়ে উঠেছে।

গাড়ি থেকে নেমে দু'জনে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। একজন গাড়িতে বসে আপন মনে হিন্দী গানের সুর ভাঁজতে লাগল।

রতন তৈরি হলো। পেছন থেকে আচ্‌মকা সে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার উপরে।

লোকটা হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে হক্‌চকিয়ে গেল—আত্মরক্ষার কোনও সুযোগ পেল না।

রতন লোকটিকে সহজেই কাবু করে ওর মুখে কাপড় গুঁজে মুখ হাত পা বেঁধে ফেলল।

তারপর তাকে গাড়িতে রেখে ঢুকল বাড়িটার মধ্যে।

গভীর রাত। চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার বিরাজ করছিল।

মেঝেও স্যাঁতসেতে। গা ছম্ ছম্ করে ভেতরে ঢুকতে। সাহসে ভর করে রতন এগিয়ে চলল।

সামনে একটা সিঁড়ি। আস্তে আস্তে রতন সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল! একহাতে টর্চ অন্য হাতে পিস্তল। উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছিল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে দেখল, একটা ঘরে দু'জন লোক কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে।

রতন নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপচাপ শুনতে লাগল ওদের কথা।

রতন বুঝতে পারল, দু'জনেই ড্রাগনের দলের লোক।

একজন বললে—সত্যি, আমরা কাজ ভালই করেছিলাম। কিন্তু গোলমাল করছে টিকটিকি আর তার সহকর্মীটা।

—তা বটে। ব্যাটারা এবার মরবে।

—সত্যি। কর্তার ক্ষমতা কত ওরা তা জানে না। তাই এসব করছে।

—সত্যি। কর্তা ওদের শেষ করছে না কেন?

—অত সহজ নয়।

—কেন?

—ওরা যেন যাদু জানে। হঠাৎ যে কেমন করে পালায় কেউ জানতেও পারে

না।

—ভাল কথা। বিল্লু এখানে আসছে না কেন বল্ ত?

—তা ত জানি না।

—হয়ত টিকটিকির হাতে পড়েছে।

—দূর! এত সহজ নয় যে, এখানে চট্ করে চলে আসবে ওরা।

—তা বটে।

—আচ্ছা হোয়াং এখনো আসছে না কেন? হোয়াং না এলে কর্তার আদেশ কি, তা ত জানা যাবে না।

—কর্তা হোয়াংকে খুব খাতির করে—তাই না?

—হ্যাঁ।

—হোয়াং কর্তার ডান হাত যে!

—আচ্ছা, কর্তা ত এখন ২৬ নং বাড়িতেই আছে—তাই না?

—তাই ত মনে হয়।

রতন ওদের কথা মন দিয়ে শুনছিল। কিন্তু সেই সময় আরও একজন তাকে হঠাৎ পেছনের দিক থেকে আক্রমণ করবে তা সে ভাবতে পারেনি।

হঠাৎ রতন পেছনে পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠল।

চেয়ে দেখে একজন লোক ছোরা হাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। চোখে তার হিংস্র দৃষ্টি।

রতন সচকিত হলো।

লোকটা এগিয়ে আসতেই রতন তার উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

দু'জনে লড়াই শুরু হয়ে গেল।

একবার রতন লোকটাকে কাবু করে ফেলে—আবার একবার লোকটা রতনকে কাবু করে।

এমনি ভাবে দু'জনে লড়াই চলছিল।

অবশেষে লোকটা রতনের উপরে উঠে বসে তাকে কাবু করার উপক্রম করছিল, এমন সময় হঠাৎ কে এসে লোকটার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল।

লোকটা লুটিয়ে পড়ল।

রতন তাকাল।

দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী।

রতনের মন আনন্দে ভরে উঠল।

।। দশ।।

রতন বিপন্ন

দীপক এদিকে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল না।

রতনের কাছ থেকে ঠিকানাটি পেয়েছিল সে। প্রিন্সেপ স্ট্রীটের সেই বাড়িতে গিয়ে সে দেখতে পেলো, সেটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

দীপক ভাবল। তবে কি ড্রাগন এই বাড়িতে নেই? সে গেল কোথায়?

এমন সময় সে পথ দিয়ে এগিয়ে কয়েকটি বাড়ি পার হয়ে দেখে একটা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তাতে একজন লোক বাঁধা পড়ে আছে।

দীপক ভাবল, এ নিশ্চয় রতনের কীর্তি। রতন তা হলে এখানে এসেছিল। কিন্তু সে কোথায় গেল তা জানতে পারল না।

দীপক তখন বাড়িটির মধ্যে প্রবেশ করবে ভাবল। তার আগে সে গিয়ে মিঃ গুপ্তকে ফোন করল।

মিঃ গুপ্ত ফোন ধরে বললেন—কি ব্যাপার দীপকবাবু?

—ড্রাগনের সন্ধান পেয়েছি।

—কোথায়?

—প্রিন্সেপ স্ট্রীটে, এখুনি পুলিশ ভ্যান নিয়ে চলে আসুন।

—ঠিক আছে।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল। তারপর সেই বাড়িটার কাছে এসে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

দোতলায় উঠে দেখে রতনের সঙ্গে একজনের লড়াই হচ্ছে।

দীপক তখন লোকটাকে ঘায়েল করে বেঁধে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে।

ভেতরে যারা ছিল তারা শব্দ শুনে বের হয়ে এলো।

দীপক পিস্তল উদ্যত করে বললে—কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করব।

তারা হাত তুলল।

রতন একে একে তাদের বেঁধে ফেলল।

এমন সময় আরো একজন বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশ করেছিল।

সেও আচমকা আক্রান্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

বন্দীদের নিয়ে দীপক অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই এলেন মিঃ গুপ্ত।

তিনি সব শুনলেন। সব দেখে তিনি বন্দীদের গাড়িতে তুলে পাঠিয়ে দিলেন লালবাজারে।

তারপর দীপককে বললেন—এদের দলপতি কোথায় তা জানেন?

—জানি।

—কোথায়?

—বোধ হয় ২৬/৩ নং বাড়িটি সার্চ করলেই পাওয়া যাবে।

—সত্যি?

—চলুন দেখা যাক্।

মিঃ গুপ্তকে বেশ চিন্তিত দেখায়। তিনি বললেন—ওটা যে একজন ধনী লোকের বাড়ি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা হলে ও বাড়িতে—

দীপক বললে—সে দায়িত্ব আমার।

—তবে চলুন।

ওরা রওনা হলো দলপতিকে ধরবার উদ্দেশ্যে।

নির্দিষ্ট সময়ে পুলিশ ভ্যান এসে দাঁড়াল ২৬/৩ নম্বর বাড়ির কাছে।

পুলিশ ভ্যানকে একটু দূরে দাঁড়াবার নির্দেশ দিলে দীপক।

তার কথামত মিঃ গুপ্ত ভ্যানকে দূরে দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

দীপক বললে—আমি পিস্তলের আওয়াজ করা মাত্র আপনারা বাড়িতে ঢুকবেন।

—আচ্ছা।

—আর বাড়িতে ঢুকে বিনা বিচারে সকলকে গ্রেপ্তার করবেন।

—ঠিক আছে।

দীপক এগিয়ে চলল বাড়িটার দিকে।

ধীর পায়ে এগিয়ে যায় সে বাড়ির সামনে। বাড়ির সামনে গিয়ে কড়া নাড়ল।

খট্ খট্ খট্—

সশব্দে কড়া নড়ে উঠল।

একজন নারী এসে দরজা খুলে দিল। দীপক তাকে দেখে চমকে উঠল।

এ মেয়েটি আর কেউ নয়—ড্রাগনের প্রধান সহকর্মিণী লায়লা।

দীপক তাকাল মেয়েটির দিকে। বললে—বিশেষ কারণে আমাকে আসতে হয়েছে। আপনার নাম জানতে পারি কি?

—মিস্ ডরোথি।

দীপক বুঝল মেয়েটি মিথ্যা কথা বলছে। তবু সে তা বললে না।

বললে—এ বাড়ির মালিক আছেন নাকি?

—হ্যাঁ।

—তাঁকে একটু প্রয়োজন।

—কেন?

—সেটা গোপনীয়। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—আপনি কে?

—আমি লালবাজারের অর্ডার পেয়েই আসছি।

—ঠিক আছে আসুন।

দীপক কয়েক পা এগোল।

বাঁ দিকের একটা ঘর।

লায়লা বললে—উনি ও ঘরে আছেন।

দীপক পর্দা সরালো।

ছোট ঘর। একপাশে দু'তিনটি ড্রাম রাখা আছে।

দীপক বুঝল, তাতে আছে নানান ধরনের চোরাই মাল।

দীপক বললে—এই যে আপনি—

কিন্তু ঘরে যে লোকটি ছিল সে হলো ড্রাগনের অনুচর ইব্রাহিম।

সে কোনও কথা বললে না। আচম্‌কা সে পিস্তল বের করল।

দীপক নির্বিকার।

ইব্রাহিম বললে—দীপক চ্যাটার্জী, আমি তোমাকে চিনেছি। তুমি আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না।

—হ্যাঁ, আমিই দীপক—

—তুমি কি ভেবেছ?

—তার মানে?

—মানে, এখান থেকে তুমি বেরিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখ?

—না।

—তবে?

—আমি তোমাদের শেষ কোথায় তা শুধু দেখতে চাই।

—তুমি শেষ দেখবে?

—হ্যাঁ।

—দীপক নানা কথা বলে শুধু সময় কাটাচ্ছিল মাত্র।

—সে অপেক্ষা করছিল সুযোগের। আচমকা সে সুযোগ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক ঝট্‌কায় ইব্রাহিমের উপর।

গুড়ুম....

ইব্রাহিমের পিস্তল গর্জে উঠল।

কিন্তু গুলিটা গিয়ে বিদ্ধ হলো ঠিক সামনের দেওয়ালে

দীপক তার আগেই নিজেকে সাবধান করে নিয়েছি

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে ইব্রাহিমের হাতে একটা লাথি মারল।

ইব্রাহিমের হাত থেকে পিস্তল ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল দেওয়ালের কোণে।

দীপক লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল সেটা তুলে নেবার জন্যে।

কিন্তু সুযোগ সে পেল না। দীপক যখন পিস্তলটা কুড়িয়ে নিতে গেছে, তার আগেই ইব্রাহিম তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দু'জনে শুরু হল ভয়ংকর মল্লযুদ্ধ। কখনো ইব্রাহিম জেতে, কখনো দীপক জয়লাভ করে।

লায়লা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল ঠিক দরজার উপরে।

এক সময়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে সে। কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার আগেই যুদ্ধরত দীপক তার পেটে এমন একটা লাথি মারল শুয়ে শুয়েই, যে লায়লা প্রায় দশ হাত দূরে ছিট্‌কে পড়ল।

আবার লায়লা এগিয়ে এলো।

সে দু'জনের মল্লরণ দেখতে লাগল, কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে। ঘরের ভেতরে ঢোকার সাহস তার ছিল না।

অচম্‌কা ইব্রাহিম দীপককে একটা প্যাঁচে উল্টে ফেলে কোণে পড়ে থাকা পিস্তলটা নিতে এগিয়ে গেল।

দীপক মুহূর্তে তার পা ধরে একটানে তাকে ছিটকে দিল ঘরের অন্য কোণে।

ইব্রাহিম বুঝতে পারল যে, দীপক ঐ পিস্তলটা নিতে চায়। সেও বাঘের মত লাফ দিয়ে পড়ল তার উপরে।

যুদ্ধ শুরু হলো দু'জনের মধ্যে। লায়লা দরজায় দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগল— কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার সাহস তার ছিল না।

হঠাৎ ইব্রাহিম দীপকের মাথায় এক ঘুঁষি মারল।

দীপক তাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইব্রাহিম পিস্তলটা নিতে এগিয়ে গেল।

দীপক তার তলপেটে প্রচণ্ড ঘুঁষি মারল। সে কোঁত্‌ শব্দ করে পড়ে গেল।

দীপক পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে পর পর তিনবার ফায়ার করল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী প্রবেশ করল বাড়িতে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় লায়লা ও ছদ্মবেশী ড্রাগন আগেই বাড়ি থেকে পলায়ন করল গুপ্তপথে।

ইব্রাহিম ধরা পড়ল। ধরা পড়ল দলের আরও তিন-চারজন লোক।

মিঃ গুপ্ত বললেন—আপনার অনুমান সত্যি ছিল দীপকবাবু। কিন্তু-

দীপক [illegible] ত বলি, আইনমত সব সময় ক্রিমিন্যালদের শাস্তি দেওয়া যায় না।

—তা বটে।

দীপক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আন্তর্জাতিক চক্রে ড্রাগন

।। এক।।

ভূগর্ভ কক্ষ

কোলকাতা শহরের শহরতলীর একাংশে একটি সুন্দর ও সুসজ্জিত কক্ষ।

বিভিন্ন বেশধারী, নানা জাতের প্রায় পঁচিশ জন লোক এই ঘরে বসেছিল চুপচাপ। তাদের ঠিক সামনে একটি পুরু গদির উপরে বিছানা পাতা। তার উপরে একজন লোক অর্ধশায়িত ছিল। সে দেখতে বেশ বলিষ্ঠ। তার মুখে একটি কালো আবরণ। লোকে তাকে বিখ্যাত ড্রাগন দস্যু দলের দলপতি বলে জানে।

নির্জন একটি জঙ্গলের মধ্যে অট্টালিকার ভূগর্ভস্থ কক্ষ এটা।

অতীত যুগে, মুসলমান রাজত্বের শেষ সময়ে বোধহয় এটা কোনও আমীর ওমরাহ বা জমিদারদের বাগানবাড়ি ছিল। মারাঠা বর্গীর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঐ সময়ে প্রতিটি ধনী লোকই এই ধরনের ভূগর্ভস্থ কক্ষ তৈরী করত। তারপর কালের কবলে পড়ে সেই সুরম্য বাগানবাড়ি আজ আর নেই। তা জঙ্গলাকীর্ণ। দিনের বেলাতেও কোনও পথিক এদিকে আসতে ভয় পায়।

এমনি পরিত্যক্ত বাগানবাড়িতে ঢুকে যদি কেউ তার নীচের এই ভূগর্ভস্থ কক্ষে আসে, তা হলে সে নিশ্চয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাবে। মানুষের অগম্য ঐ অট্টালিকার প্রতিটি কক্ষে শুধু বিলাসের সামগ্রী। বিভিন্ন ঘরে সুন্দর শয্যা পাতা—খাদ্য ও পানীয়ের জন্য গুদামঘরও আছে একটা। প্রচুর সব আয়োজন।

ড্রাগনের দলপতি বললে—তোমরা এখন যাও। তোমাদের কথা আমি চিন্তা করে দেখব।

কথাটা শুনে একজন বাদে বাকী সকলে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সকলে চলে যাবার পর যে লোকটা বসে রইল সে হলো ড্রাগনের ডান হাত, দস্যু হীরালাল। তাকে কাছে ডাকল ড্রাগন। কাছে এসে বলতে লাগল—এবার তাহলে কাজ শুরু করতে হবে।

তা শুনে হীরালাল বললে—কর্তা, এসব বিপজ্জনক কাজে না যাওয়াই ভাল। তাই নয় কি?

ড্রাগন বললে—তুমি কি ভয় পেয়ে গেলে?

—হীরালাল জীবনে ভয় পায় না।

—তবে? যা হোক, কাগজ ও পেন নিয়ে এসো।

হীরালাল কাগজ ও পেন আনলে একটি চিঠি লেখা হলো। ড্রাগন বললে—এটা ডাকে ফেলে দাও এক্ষুণি।

—আচ্ছা কর্তা।

সে চলে গেলে ড্রাগন দু'বার হাততালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোক ঢুকল ঘরের মধ্যে। একজনের নাম রমেশ, অন্যজনের নাম কালু।

—রমেশ, তুমি একটা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিখারী সেজে এসো।

—আচ্ছা কর্তা।

—আর কালু, তুমি একজন জমিদারের মতো ধনীর বেশ পরে এসো।

—আচ্ছা কর্তা।

তারা বেরিয়ে গেল।

ড্রাগন বসে নীরবে চিন্তা করতে লাগল।

একটু পরে নিজেও বেশভূষা পরে তৈরী হয়ে নিল। তবে মুখের আবরণ ঠিক থাকল তার।

দেখে মনে হয় অনেক দূরে কোনও কাজে রওনা হবে।

এমন সময় হীরালাল ফিরে এসে জানাল—কর্তা, চিঠি তাকে দিয়ে এসেছি।

—ঠিক আছে। চল আমার সঙ্গে।

দু'জনে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে স্টার্ট দিল। তারপর কি মনে করে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ডাক দিল দু'বার—হিউ, হিউ বলে।

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে দুজনে বেরিয়ে এলো। একজন কুষ্ঠরোগীর সাজে সজ্জিত রমেশ—অন্যজন ধনী জমিদারের বেশে সজ্জিত কালু।

রমেশ বললে—কর্তা, আমাদের কি যেতে হবে আপনার সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

দু'জনে উঠে বসল গাড়িতে।

ড্রাগন বললে—তোমাদের যেখানে নামিয়ে যা কাজ করতে বলব তা করতে পারবে ত?

—নিশ্চয় কর্তা

—ঠিক আছে।

দু'জনকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে মোটর তীব্র গতিতে কোলকাতার দিকে ছুটে চলল।

।। দুই।।

চক্রান্ত জাল

কোলকাতা শহরের ধনকুবের ও বিখ্যাত লোক হলেন রায়সাহেব বীরেন্দ্র লাহিড়ী। তাঁকে সেদিন সকাল বেলা খুব চিন্তিত দেখা গেল।

বিখ্যাত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দস্যু ড্রাগন তাঁকে চিঠি দিয়েছে, যদি সাত-

দিনের মধ্যে তাকে বিশ হাজার টাকা দেওয়া না হয় তা হলে তাঁর বাড়ি লুঠ হবে। এই দস্যু ড্রাগনের নামে আজ সারা শহর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। সে আজ সারা শহরে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তার কারণ আছে।

ড্রাগন সব সময় পূর্বে চিঠি দিয়ে ডাকাতি করে থাকে। আর সে এত সুকৌশলী দস্যু যে, পুলিশ তাকে কখনও ধরতে পারে না। তার মতো দুর্ধর্ষ দস্যু সারা ভারতে খুব বেশী নেই। তার সঠিক ঠিকানাও কেউ জানতে পারে না।

অনেকের ধারণা ছিল, ড্রাগন কোলকাতায় কখনো চিঠি দিয়ে ডাকাতি করবে না। এরকম কাজ সে বাইরে করতে পারে বটে, কিন্তু কোলকাতার মতো সুরক্ষিত নগরীতে তা করা যায় না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ড্রাগন যখন রায়সাহেবকে চিঠি দিয়ে বসল, তখন তিনি চিন্তিত হলেন।

তিনি কোলকাতার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলেন।

কমিশনার সাহেব ত চিঠি দেখে অবাক! তিনি এতদিন পুলিশ বিভাগে চাকুরী করছেন বটে কিন্তু এমন দুঃসাহসিক ডাকাত তিনি কখনো দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। দস্যু ড্রাগন সত্যি অসম্ভব সাহসী বটে!

যা হোক, কমিশনার সাহেব বীরেনবাবুকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—রায়সাহেব, আপনি ভয় পাবেন না। আমরা এর ব্যবস্থা করব।

—কি ব্যবস্থা?

—আমরা পুলিশের বাছা বাছা অফিসার ও গোয়েন্দাদের পাঠাব আপনার বাড়িটা গার্ড দেবার জন্যে। দেখা যাক, ড্রাগন কতটা শক্তিশালী ও কৌশলী।

কমিশনার সাহেব রায়সাহেবের সামনেই বড় বড় ক'জন অফিসারকে ডেকে আদেশ দিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ব্যবস্থা করলেন নির্দিষ্ট তারিখের একদিন আগে থেকেই সারাটা বাড়ি পুলিশ দিয়ে ঘিরে রাখবেন।

একমাত্র পুলিশ কর্মচারী ছাড়া ঐ সময় বাড়িতে কারও প্রবেশের অধিকার থাকল না। অন্য কেউ প্রবেশ করতে হলে রায়সাহেবের অনুমতি নিয়ে ও পুলিশকে তল্লাসী দিয়ে প্রবেশ করবে।

এইভাবে সব বিষয়ের সুব্যবস্থা করে রায়সাহেব পুলিশ অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু পথে এসে গাড়িতে করে যেতে যেতে তাঁর মনে সন্দেহ জাগল, যে লোক এইভাবে প্রকাশ্যে চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে পারে, সে নিশ্চয় জানে যে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করা হবে।

তা সত্বেও সে এত বড় সাহস পায় কি করে? আর তাই পুলিশকে সে গ্রাহ্য

করে না। তাদের সামনে দিয়ে সে নিশ্চয় কাজ হাসিল করে যেতে পারে।

তা হলে এখন উপায় কি?

হঠাৎ রায়সাহেবের মনে পড়ে, বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর কথা।

দীপক যদিও প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তা হলেও কোলকাতার পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার থেকে সকলেই তাকে সম্মান করে চলেন।

তার কারণ হলো, তার কার্যপদ্ধতি অভিনব এবং কৌশলে সে তা সম্পন্ন করে থাকে।

দীপকের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধির কাছে ভারতের অন্য গোয়েন্দারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

তাই রায়সাহেব দীপকের সঙ্গে একবার দেখা করবেন বলে স্থির করলেন।

তিনি ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বললেন।

রায়সাহেব গাড়ি ঘুরিয়ে দীপকের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি রাখলেন।

দীপক সব কথা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপর বললে—আপনার এই বিপদে আমি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনি যে আমার কাছে এসেছেন একথা ঘূণাক্ষরেও কাউকে জানাবেন না। এমন কি, স্বয়ং কমিশনার সাহেবকেও নয়। আপনি যদি ইতিমধ্যে কোনও সংবাদ জানাবার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে টেলিফোন করে খবর দেবেন। আমিও প্রয়োজন হলে টেলিফোন করব আপনাকে।

—ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

রায়সাহেব বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

লাইট রেলওয়ে পাতিপুকুর ষ্টেশনের থেকে মাইল খানেক দূরে একটা বড় টিনের ছাউনিযুক্ত কারখানা ঘরের মতো ছিল।

এই ঘরের ঠিক সামনে এসে সেই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিখারী হাক দিল—বাবা, দুটি ভিক্ষা পাই বাবা!—বলে সে দরজায় পাঁচবার টোকা দিল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

ভেতর থেকে একজন বললে—দাঁড়াও।

ভিখারীটা ভেতরে প্রবেশ করলে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সামনে একটা উঠান। সেটা পার হয়ে একটা বড় ঘর।

ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে বসে মুখোশধারী ড্রাগনের দলপতি প্রতীক্ষা করছিল।

কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিখারীটা ভেতরে ঢুকেই ছদ্মবেশ অপসারিত করল। তারপর সাধারণ পোশাক পরে ড্রাগনের দলপতিকে অভিবাদন জানাল।

দলপতি বললে—খবর কি রমেশ?

রমেশ বললে, কালুটার বুদ্ধি আছে। এটা সে তোমার ঝুলিতে ফেলে দিয়েছিল?

—হ্যাঁ কর্তা। কালু জমিদারপুত্রের বেশে প্রতীক্ষা করছিল লালবাজারে। রায়সাহেব পুলিশ কমিশনারের ঘরে ঢুকলে সে একজন সিপাইকে দুটো টাকা দিয়ে বললে যে, সে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে। এই বলে সে পুলিশ কমিশনারের ঘরের বাইরে একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে করতে ভেতরের সব কথা শুনতে পায়। তারপর সে আবার সিপাইকে বলে পরে আসব, এখন উনি ব্যস্ত। এই বলে সে আবার দুটো টাকা দিয়ে চলে আসে।

—তা একজন জমিদারপুত্রের পক্ষে এমনি টাকা না ছড়ালে চলবে কেন?

বলেই ড্রাগন হেসে উঠল।

তারপর বললে—যাক, এবারে তোমার কথা বল ত রমেশ।

রমেশ বললে—আমি ঐ দীপক চ্যাটার্জীর বাড়ির খুব কাছে বসে ভিক্ষা করছিলাম। এমন সময় কালু আমাকে ভিক্ষা দেবার ছল করে চিঠিটা ফেলে দিয়ে গেল ট্যাক্সি চেপে।

কিছুক্ষণ পরে দেখি রায়সাহেব ঢুকল সেখানে। লোকটা ভেতরে চলে গেল। সে যখন ভেতরে ঢুকেছিল তার মুখটা তখন ছিল খুবই চিন্তাচ্ছন্ন। যখন বেরিয়ে এলো তখন দেখি তার মনে কোন চিন্তা নেই। তাই বুঝতে পারলাম যে, সে কিছুটা সফল হয়েছে তার কাজে। দীপক চ্যাটার্জী নিশ্চয় তাকে আশ্বাস দিয়েছে।

রমেশের কথা শুনে হীরালাল চিন্তিত সুরে বললে—তাহলেই ত মুস্কিল। গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী যখন এ ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে তখন সহজে কাজ উদ্ধার হবে না।

হীরালালের কথা শুনে ড্রাগন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বললে—কি যা তা কথা বলছিস? আমি দীপকের নাকের ডগা দিয়ে কতবার কাজ করে বেরিয়ে গেলাম না? ওকে আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না। এই বলে ড্রাগন একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে লাগল।

পরদিন সকাল।

দীপক খবরের কাগজ পড়ছিল তা খেতে খেতে, এমন সময় সেদিনের ডাকের চিঠিগুলো এলো।

তাতে লেখা ঃ

মাননীয় দীপকবাবু,

আপনি অতীতে বহুবার আমার সঙ্গে সংগ্রামে রত হয়েছেন—কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন প্রতিবারই। আমার অনুরোধ, এবারে আমার সঙ্গে আর লাগবেন না—তাহলে আপনার জীবন বিপন্ন হতে বাধ্য। আপনাকে বন্ধুভাবে উপদেশ দিচ্ছি—এ ব্যাপারে মাথা গলিয়ে অপদস্থ হবেন না। ইতি—ড্রাগন।

দীপক চিঠিটা পড়ে একটু হেসে তা রতনের হাতে তুলে দিল।

রতন বললে—কি ব্যাপার রে?

—ড্রাগনের অযাচিত উপদেশ।

—দূর! এবারে ওকে ধরতেই হবে, যে কোন উপায়ে হোক না কেন।

—তা বটে।

দু'জনে তখন পরিকল্পনা করতে বসে গেল পরবর্তী কর্মপদ্ধতি নিয়ে।

।। তিন।।

দিবালোকে ডাকাতি

নির্দিষ্ট তারিখের দুদিন আগে থেকেই রায়সাহেবের বাড়ির চারিদিকে সশস্ত্র পুলিশের দল বসে গেল। বিশেষ পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হলো। বিনা অনুমতিতে কেউ বাড়িতে ঢুকতে পারবে না।

পুলিশ ছাড়া অন্য কাউকে ঢুকতে হলেই তার জন্য রায়সাহেবের অনুমতি নিতে হবে। তারপর তার দেহে থানাতল্লাসী করে তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে।

তাছাড়াও লালবাজার এবং কোলকাতার সমস্ত থানার ইনস্পেক্টররা এসে থানায় থানায় গিয়ে তদ্বির করছিলেন। কমিশনার সাহেব নিজে দিনে দু'তিন বার ফোনে খবর নিচ্ছিলেন। যেমন করেই হোক ড্রাগনকে ধরতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে সকাল সাতটা কি আটটার সময় দেখা গেল রায়সাহেবের বাড়ির সামনেই পার্কে একজন শিখ বসে আছে।

বেলা ক্রমে এগারোটা বেজে গেল। কোন দিকে কোন গোলমাল নেই অথচ সকলেই বেশ একটু সন্ত্রস্ত।

এমন সময়ে একটা কালো রঙের মোটরগাড়ি এসে রায়সাহেবের বাড়ির ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

তার ভেতর থেকে দু'জন পুলিশ ইনস্পেক্টার বের হয়ে রায়সাহেবের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। পুলিশ প্রহরীরা সকলে সেলাম করে পথ ছেড়ে দিল।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে সামনে রাজার সরকারকে দেখে তাঁদের একজন বললেন—এই, শুনছ!

—কি স্যার?

—রায়সাহেব কোন ঘরে আছেন?

—সোজা দোতলায় চলে যান হুজুর।

—ঠিক আছে।

দু'জনে দোতলায় উঠে গিয়ে রায়সাহেবের ঘরে ঢুকলেন।

নিভৃত ঘর। রায়সাহেব একা বসে বই পড়ছিলেন। পাশে টেলিফোন রাখা আছে।

বাড়ির চাকর-বাকর অথবা অন্য কারো বিনা প্রয়োজনে সেদিকে যাবার হুকুম নেই।

একজন চাকর তাঁদের দুজনকে সেই ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

দু'জনে ঘরে ঢুকেই একজন দরজা বন্ধ করল। অন্যজন হঠাৎ পিস্তল বের করে চাপা গলায় বললে—আপনাকে বিশ হাজার টাকা পাঠাতে বলা হয়েছিল, তা কেন পাঠাননি?

রায়সাহেব নির্বাক—কোন কথা সরল না তাঁর মুখ দিয়ে। তিনি থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন।

—উত্তর দিন। চুপ করে থাকলে চলবে না। চীৎকার করলে একটা গুলিতে শেষ করে দেবো। এই পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো আছে—কোন শব্দ হবে না।

রায়সাহেব দেখলেন কোনও পথ নেই।

তিনি বললেন—কি চান আপনারা?

—আমরা ড্রাগনের লোক। আমরা কখনো মিথ্যা আস্ফালন করি না। আপনি বিশ হাজার টাকা দিতে চাননি—এখন ত্রিশ হাজার টাকা দিতে হবে।

—না না, এত টাকা আমার নেই।

—বাজে কথা। আপনার ঐ সিন্ধুকে লক্ষাধিক টাকা আছে। সব ব্ল্যাক মানি। আমরা সব কথা জানি। ব্যাঙ্কের টাকা আমরা চাই না। ঐ ব্ল্যাক মানি থেকে এখন ত্রিশ হাজার চাই—তা না হলে আপনাকে হত্যা করে সব টাকা নিয়ে চলে যাব আমরা।

রায়সাহেব কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন।

পায়ে পায়ে তিনি এগিয়ে গেলেন সিন্দুকের কাছে। তারপর কোমর থেকে চাবি বের করে তিনটি দশ হাজারের নোটের বাণ্ডিল বার করে দিলেন দস্যুদের হাতে তুলে।

দস্যুরা টাকা নিয়ে দু'জনে ভাগাভাগি করে ইনসাইড পকেটে পুরে ফেলল। তারপর টেলিফোনের তার কেটে দিল। তারপর দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে রায়সাহেবের ঘরটা তালাবন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

নীচে নেমে দু'জনে দেখল, পুলিশরা ঠিক তেমনি পাহারা দিচ্ছে।

তারা বললে—হুঁশিয়ারভাবে কাজ কর—খুব সাবধান!

বলে দু'জনে একটা গাড়িতে উঠে দ্রুতবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

একটু পরে—

রায়সাহেব দরজা ধরে টানাটানি ও চীৎকার করতে লাগলেন। একটু পরে

দলে দলে পুলিশ উপরে এসে পড়ল।

তালা ভাঙা হলো।

তারা ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলো যে রায়সাহেব উত্তেজনায় অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

কিন্তু এদিকে পার্কে যে পাঞ্জাবী লোকটা সকাল থেকে বসেছিল তাকে আর দেখা গেল না।

।। চার।।

এক টুকরো নক্সা

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এ সংবাদ চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়ল দ্রুতবেগে ।

টেলিফোনের তার জোড়া লাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হলো পুলিশ কমিশনারের কাছে। দীপকের বাড়িতেও টেলিফোন করা হলো। তবে তাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না।

পুলিশ কমিশনার সংবাদ পেয়েই ছুটে এলেন। সব কথা শুনে তিনি দস্যুদের কৌশল ও সাহস দেখে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন। তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অনেক দুর্ধর্ষ ও কৌশলী দস্যুদের কথা শুনেছেন বটে—কিন্তু ভারতে যে এত চতুর দস্যু থাকতে পারে তা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি।

তিনি নিজে তদন্ত করলেন। যে মোটরটিতে চেপে দস্যুরা এসেছিল তার খোঁজ নিলেন। সেটা ডেপুটি কমিশনার (নর্থ)-এর মোটরের নম্বর। দস্যুরা তাহলে মিথ্যা নম্বর ব্যবহার করেছে। ডি, সি, (নর্থের) মোটর এখন মেরামতের জন্য কারখানায় পড়ে আছে।

এদিকে যে পাঞ্জাবী লোকটা ছদ্মবেশে পার্কে বসেছিল, সে তার দামী ক্যাডিলাক গাড়িতে চড়ে বসল ও কালো গাড়িটাকে অনুসরণ করতে লাগল।

দুটি গাড়ি ক্রমে কোলকাতা সহর ছাড়িয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরল। এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আগের মোটরখানা বুঝতেই পারেনি যে, অন্য একটা মোটর তাদের অনুসরণ করছে। দমদম ছাড়িয়ে আগের মোটরখানা যখন ডানলপ ব্রিজ ছাড়ালো তখন হঠাৎ গাড়ি থেকে ভয়ঙ্কর ধোঁয়া বের হতে লাগল। গাড়িটার আর কিছুই দেখা গেল না।

একটু পরে যখন গাড়িটা দেখা গেল তখন পাঞ্জাবীটা দেখল, সেটার রং পাল্টে গেছে—নাম্বার প্লেটও পাল্টে গেছে। আশ্চর্য কাণ্ড!

এমন সময় সহসা সামনের গাড়ি থেকে মুসলধারে গুলিবর্ষণ হতে লাগল।

পাঞ্জাবী লোকটা গাড়িটা দাঁড় করাবার আগেই একটা গুলি তার মোটরের

টায়ার ফাঁসিয়ে দিল। সেটা কাত্ হয়ে পড়ল পথের পাশে।

কালো গাড়িটা চোখের নিমেষে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাঞ্জাবীটা একটা ট্যাক্সি নিল। ততক্ষণে তিন-চার মিনিট কেটে গেছে। দ্রুত ট্যাক্সিটা ধাবিত হলো। তখন সামনের গাড়িটা চোখের বাইরে চলে গেছে।

তীব্রবেগে দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চালিয়ে এসে দেখল যে, একটা জঙ্গলের ধারে সামনের সেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছে।

পাঞ্জাবীটা ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে পড়ল। এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে।

গাড়িতে কোনও ড্রাইভার বা অন্য আরোহীর চিহ্ন নেই!

পাঞ্জাবীটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। ভেতরে কোনও প্রমাণ বা সূত্র নেই। শুধু এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে এক পাশে। সেটা কুড়িয়ে নিল সে। দেখল সেটা একটা ট্রামগাড়ির টিকেট। তার পেছনে অনেক দাগ কাটা।

ভাল করে লক্ষ্য করে দীপক বুঝতে পারল যে, সেটা নক্সা মাত্র। কোনও স্থানের হয়তো গোপন নক্সা।

পাঞ্জাবীটা আর কেউ নয়—খ্যাতনামা রহস্য অনুসন্ধানী দীপক চ্যাটার্জী।

দীপক চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। সে তখন চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলল।

দস্যুর দল দীপকের মোটরের টায়ার ফাঁসিয়ে দিয়ে তাকে অচল করে দিয়েছিল। তারা বেশ নিশ্চিন্ত মনেই আড্ডায় ফিরে এলো।

সুসজ্জিত একটা বসবার ঘরে সকলে সমবেত হলে দস্যু-দলপতি ড্রাগন অন্য সকলকে লক্ষ্য করে বললে—গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী অন্য সব গোয়েন্দার মতো মোটা বুদ্ধির লোক নয়। তার মাথা খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন। তার দূরদৃষ্টিও খুব আছে। তাই আমাদের খুবই সাবধানে কাজ করতে হবে যে বুদ্ধি আমরা খাটিয়েছিলাম, কোনও সরকারী গোয়েন্দার পক্ষে তা ভেদ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ঐ দীপক চ্যাটার্জী আগে থেকেই তা আন্দাজ করে ছদ্মবেশে প্রতীক্ষা করছিল। সে ঠিক অনুসরণও করেছিল আমাদের। তোমাদের তাই সাবধান করছি, আমার বিনা হুকুমে কোনও কাজ করবে না। তাতে জানবে বিপদ হতে পারে।

ড্রাগনের কথা শুনে দলের একজন বললে—আচ্ছা কর্তা, ঐ লোকটাকে একেবারে খতম করে দিলে কেমন হয়? তাহলে তো আর চিন্তা থাকে না। সে আপনার পত্রের উপদেশ অগ্রাহ্য করেছে—এই সব হুকুম অমান্যকারীদের রীতিমত শাস্তি দেওয়াই কি উচিত নয়?

—প্রয়োজন হলে ড্রাগন তার দক্ষিণ হস্তকেও সমুচিত শাস্তি দানে কুণ্ঠিত নয়, একথা আমার সম্প্রদায়ের সকলেই নিশ্চিন্তভাবে জানে বলেই আমার বিশ্বাস।

এই কথা বলে ড্রাগন উঠে একটা দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে

লতাপাতা ও ফুল আঁকা দেওয়ালের একটি পদ্মফুলের মাঝখানে পদ্মচক্রে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিতেই দেওয়ালের একাংশ নীচে নেমে গেল। সামনে অপ্রশস্ত সিঁড়িগুলি ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে গেছে।

ড্রাগনের ইঙ্গিতে প্রত্যেক দস্যু সেই পথে একে একে নীচে নেমে গেল, সবার শেষে ড্রাগন ভেতরে প্রবেশ করে সিঁড়ির বাঁ পাশে অবস্থিত একটা বড় লৌহদণ্ডের ওপর পা দিয়ে চাপ দিতেই, সামনের প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে গেল।

এইবার ড্রাগন নিজের বিশ্রামঘরের দিকে অগ্রসর হলো। আর সকলে নিজের নিজের বিশ্রামের জায়গায় চলে গেল। কেবল তাদের মধ্যে দু'জন ড্রাগনের ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করে তার বিশ্রামঘরে প্রবেশ করল।

বন্ধ ঘরে গোপন পরামর্শের পর তারা প্রায় আধঘণ্টা পরে বাইরে এলো।

যেতে যেতে দীপক দেখল, একটা জায়গা ঠিক উঠোনের মতো পরিষ্কার করা। তার দক্ষিণ দিকে একটা চাতাল। সেখানে সিঁড়ি।

দীপক ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। উপরে এসে সে দেখতে পেল, ঠিক সামনে একটা হলঘর।

ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—তার একপাশে ফরাস—অন্য পাশে টেবিল ও চেয়ার দিয়ে সুন্দর করে সাজান।

দীপক বুঝল, ঐ ঘরেই সেদিন ড্রাগনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। সে ভাল করে ঘরটা পরীক্ষা করতে লাগল।

কিছু সময় পরীক্ষার পর সে দেখতে পেল, যেখানে সেদিন ড্রাগন বসেছিল তার ডান দিকে দালানের গায় একটা জায়গায় উঁচুমতো একটি বোতাম আছে।

দীপক অবাক হলো।

সে বোতামটা টিপল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটা বড় ফাটলের সৃষ্টি তার মধ্যে দিয়ে সার সার সিঁড়ি নেমে গেছে।

দীপক নামতে লাগল। দেখতে পেলো, সেই সিঁড়ির শেষে একটা বড় হলঘর।

এটাও আগেরটার মতোই বড় ও তাতে পাঁচ-ছ'টি তক্তাপোশ পাতা, তাতে সুন্দর বিছানা পাতা আছে।

দীপক বুঝতে পারল, এটা দস্যুদের গোপন আজ্ঞা। তার চারিদিকে ছোট ছোট সব ঘর। সেগুলি তালাবন্ধ।

দীপকের কাছে সবখোলা চাবি (মাস্টার কী) ছিল। সে তাই দিয়ে ঘরগুলির তালা খুলে দেখবে মনে মনে স্থির করল।

প্রথম ঘরটিতে গিয়ে দেখতে পেলো যে, সেটার মধ্যে অনেক বন্দুক, তরবারি, পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র-সাজান আছে। দীপক বুঝল, এটাই দস্যুদের অস্ত্রাগার।

সেই তালাটা বন্ধ করে পাশের ঘরের তালা খুলল। তার মধ্যে কাপড়-চোপড়,

বিছানাপত্র খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি সঞ্চিত আছে।

দীপক সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তালা দিতেই উপর থেকে মানুষ নেমে আসার পায়ের শব্দ শুনে টর্চ নিভিয়ে একটা চৌকির নীচে আত্মগোপন করল।

এদিকে ঘরটির মধ্যে আট-দশজন লোক প্রবেশ করল। দীপক দেখতে পেলো যে, তার মধ্যে ড্রাগনও আছে। দীপক উৎকর্ণ হয়ে তাদের আলোচনা শুনতে লাগল।

ড্রাগন বললে—দীপক পাজীটা পালিয়ে গেছে এটা দুর্বাভনার কথা।

—হ্যাঁ কর্তা।

—তখনই তাকে শেষ করতে পারলে ভাল হতো। তাই না?

—তা বটে।

—যাই হোক, যা হয়ে গেছে তা ভেবে ত কোনও লাভ নেই। এদিকে আমাদের কাজ ত বেশ ভালভাবেই চলেছে।

—কত টাকা হলো কর্তা?

—বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকা আমি এক সপ্তাহের মধ্যে ধনাগারে সঞ্চয় করেছি।

—বহুৎ আচ্ছা।

—আন্তর্জাতিক দলকে দিতে হবে প্রায় চার লক্ষ টাকা।

—তাতে কম হবে না?

—হলোই বা। ওরা কি হিসাব রেখে বসে আছে নাকি?

—তা বটে।

—কাজ করছি আমরা—ওরা মিথ্যা এত টাকা নেবে কেন?

—তা অবশ্য ঠিক।

—চল, এখন যাওয়া যাক। আমাদের নতুন কাজের সময় হলো।

—হ্যাঁ, চলুন।

সকলে বেরিয়ে গেল।

দীপক তারপর শেষ ঘরটির তালা খুলে ভেতরে গেল। দেখল, সে ঘরে দু'-তিনটে বিরাট গহ্বরযুক্ত মস্ত বড় সিন্দুক। একটি সিন্দুকের গায়ের বোতাম ধরে টিপতেই সেটা খুলে গেল।

তার মধ্যে হাজার হাজার টাকা আর সোনা, মণিমুক্তা সাজান।

দীপক সেটা বন্ধ করল। বুঝতে পারল, এটা দস্যুদের ধনাগার।

সে আর দেরি না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। দেখল বাড়িতে কেউ নেই। সব গেছে বোধহয় ডাকাতি করতে।

দীপক পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে এসে চলল জঙ্গলের পথ ধরে।

খুব সন্তর্পণে পথ চলতে লাগল সে।

।। দশ।।

মল্লযুদ্ধ

ধীর পায়ে চলছিল দীপক।

খুব সন্তর্পণে—যাতে শত্রুরা কেউ বুঝতে না পারে তার গতিবিধি।

গভীর বন।

অন্ধকার নেমে এসেছে চারিদিক থেকে। মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক।

জোনাকিরা উড়ছে আলো জ্বেলে।

হঠাৎ—

দীপক শুনতে পেলো পায়ের শব্দ। কে বা কারা যেন আসছে।

দীপক সরে গেল। একটা গাছের আড়ালে সে লুকিয়ে পড়ল হঠাৎ।

কিন্তু যে আসছিল সে তার পায়ের শব্দ পেয়েছিল।

লোকটা হলো ড্রাগনের প্রিয় অনুচর হীরালাল স্বয়ং।

হীরালাল হাঁক দিল—কে ওখানে?

দীপক উত্তর দিল না।

হীরালাল তখন আচম্‌কা দীপকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দীপকও তৈরী ছিল। কারও গায়েই জোর কম নয়।

দু'জনে সেই নির্জন বনে মল্লযুদ্ধ শুরু করে দিল।

হীরালাল বললে—তোর ভাগ্য ভাল যে, দলের সবাই বেরিয়ে গেছে—তা না হলে এতক্ষণ তোকে কেটে টুকরো টুকরো করতাম।

দীপকও প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল হীরালালকে কাবু করতে।

হঠা? হীরালাল প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় ফেলে দিল দীপককে।

দীপকও তাকে নিয়েই পড়ে গেল—দু'জনে ঝাপটাঝাপটি করতে লাগল।

হীরালাল আচম্‌কা ফাঁক পেয়ে কোমর থেকে পিস্তল বের করল। সেটা সে দীপককে লক্ষ্য করে উদ্যত করল।

দীপক তার হাতটা চেপে অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখল।

এইভাবে ধাক্কাধক্কি করতে করতে হঠাৎ হীরালাল পিস্তলটার ট্রিগার টিপে দিল জোরে।

দীপকও প্রাণপণে তার হাতটা বেঁকিয়ে দিয়েছিল। গুলিটা গিয়ে লাগল হীরালালের বাঁ কাঁধে।

হীরালাল লুটিয়ে পড়ল সেখানেই।

দীপক তার আহত দেহটা ফেলে রেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর দৌড়াতে

দৌড়াতে এসে উঠল গাড়িতে।

হীরালাল আহত ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল বনের ভেতর।

দীপক গাড়িতে উঠেই রতনকে বললে—জোরে গাড়ি চালা।

—কোন দিকে?

—সোজা বরাহনগর।

গাড়ি ছুটল।

আধঘণ্টার মধ্যেই গাড়িটা এসে থামল বরাহনগর বাজারের কাছে।

দীপক একটা দোকানে গেল। সেখানে তার কার্ডটা দেখিয়ে সে ফোনটা তুলে নিল, ফোন করল সে পুলিশ কমিশনারকে।

—হ্যালো, কে?

—আমি দীপক চ্যাটার্জী বলছি।

—কি খবর?

—ড্রাগনের গোপন আড্ডার সন্ধান পাওয়া গেছে। এক্ষুণি ক'টা পুলিশ ভ্যান নিয়ে চলে আসুন বরাহনগর বাজারে।

—আপনি ওখানেই আছেন?

—হ্যাঁ—আমি এ রতন দু'জনেই আছি।

—ঠিক আছে। আমরা এক্ষুণি যাচ্ছি ওখানে সদলে।

—থ্যাঙ্ক্ ইউ।

দীপক ফোনটা নামিয়ে রাখল।

রতন বললে—কি খবর রে?

—খবর খুব ভাল।

—ওদের আস্তানা এটা ঠিক ত?

—নিশ্চয়।

—কি করে তা জানতে পারলি?

—ওদের দলের গুপ্ত ধনভাণ্ডার পর্যন্ত আমি দেখে এসেছি।

—ঠিক ত?

—নিশ্চয়ই—কোনও সন্দেহ নেই।

রতন খুশী হলো। বললে—আজ তাহলে আমাদের জীবনের একটা স্মরণীয় অভিযান। তাই নয় কি?

—সত্যিই তাই।

দীপক উদ্‌গ্রীবভাবে অপেক্ষা করতে লাগল পুলিশ ভ্যানের জন্যে।

।। এগারো।।

মৃত্যুফাঁদ

সময় কেটে চলল।

পুলিশবাহিনী রেডি হয়ে আসতে দেরি করছে। দীপক অধৈর্য হয়ে উঠল।

প্রায় আধ ঘণ্টা কি আরও বেশি সময় কেটে গেল। দীপক তারপর শুনতে পেলো মোটরের গর্জন।

দীপক উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

হঠাৎ শোনা গেল আবার মোটরের গর্জন। দীপক চেয়ে দেখল তিনটি গাড়ি একসঙ্গে ছুটে আসছে।

দুটি পুলিশ ভ্যান—তাতে আর্মড পুলিশ বোঝাই করা। তার সঙ্গে একটি জীপ। তাতে দু'তিন জন বড় বড় অফিসার।

মিঃ গুপ্ত নামলেন গাড়ি থেকে। বললেন—পুলিশ কমিশনারের কাছে শুনেই আমি আসছি।

—তা ভাল। কিন্তু তিনি আসেননি ত?

—না, আমরাই ব্যবস্থা করবো।

—ঠিক আছে, চলুন।

তক্ষুণি গাড়ি ছুটে চলল নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে।

বনপথে পুলিশ ভ্যান ঢুকল না। ভ্যান রেখে সবাই ছুটে চলল বন্দুক ও পিস্তল উদ্যত করে। কিছুক্ষণ চলার পর যে জায়গাতে দীপকের সঙ্গে হীরালালের সংঘর্ষ হয়েছিল সেখানে এসে পৌঁছল ওরা।

দীপক বিস্মিত হলো—হীরালালের আহত দেহটা সেখানে নেই!

দীপক বললে—কি হলো—লোকটার আহত দেহটা কে যেন নিয়ে গেছে। হয়ত এতক্ষণে সব টের পেয়ে গেছে ওরা।

—দেখা যাক।

সদলে পুলিশবাহিনী চলল বনজঙ্গল ভেদ করে। সঙ্গে সঙ্গে চলল দীপক।

অনেকটা পথ চলল তারা—অবশেষে এসে পৌঁছল সেই আড্ডা বাড়িতে।

দীপক ফায়ার করল। কোনও উত্তর নেই তার। সদলে ভেতরে ঢুকল পুলিশ। কিন্তু সব ঘর ফাঁকা—কেউ নেই।

দীপক বললে—চলুন ত সেখানে হীরা-জহরৎ টাকা-পয়সা ছিল, সে ঘরটা দেখি।

সেখানেও গিয়ে দেখল হীরা-জহরৎ অদৃশ্য। দলের কোন লোক নেই।

দীপক বললে—তাহলে ওরা সন্দেহ করে পালিয়ে গেছে।

—তাই ত মনে হচ্ছে।

খানিক পরে ওরা দেখল, জঙ্গলের এক অংশ থেকে শব্দ করে একটা হেলিকপ্টার উড়ল আকাশে।

দীপক বললে—হেলিকপ্টার ছিল কোথায়?

—তাই ত ভাবছি।

চলুন, জঙ্গলের ঐ দিকটাতে দেখা যাক।

তারা ঐদিকে গিয়ে দেখল, একটা হেলিকপ্টারে করে ড্রাগনের দল পালিয়েছে। আর একটা তখনো পড়ে আছে একপাশে।

দীপক বললে—আশ্চর্য! জঙ্গলের এই গুপ্ত স্থানে ওরা দু'দুটো হেলিকপ্টার রেখেছিল দেখতে পাচ্ছি।

—তা ত বটেই। চলুন, আমরা এটাতে উঠে বসি।

তখনই অন্যটাতে উঠে বসল দীপক ও মিঃ গুপ্ত। তার পেছনে বসল একজন আর্মড অফিসার।

ওরা পালাবার সময় অন্যটা খারাপ করে গেছিল। দীপক তাড়াতাড়ি সেটা মেরামত করতে সক্ষম হলো।

সেটা চলল—আগেরটার থেকে অনেক পেছনে।

দুটি হেলিকপ্টার উড়ল নীল আকাশে। দূরত্ব অনেকটা। তবে অন্যটি তখনো চোখের বাইরে যায়নি। সামান্য বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে।

দীপক নিজে ড্রাইভ করতে লাগল।

সেটা উড়ে চলল আকাশপথে। সামান্য উপরে উঠেই দীপক ধাবিত হলো আগেরটার পথে।

তার সারা মন যেন নতুন উত্তেজনায় ভরে উঠল। আজ ড্রাগনকে ধরতে হবে।

।। বার ।।

সাগরের বুকে

হীরালালের আহত দেহের সন্ধান ড্রাগন আগেই পেয়ে গিয়েছিল। সে বুঝেছিল, নিশ্চয় দীপক বা তার দলবল গুপ্ত আড্ডার খবর জেনে গেছে। এক্ষুনি তারা আসবে।

তাই ড্রাগন তার দলের একজনকে সঙ্গে নিয়ে একটা বড় ব্যাগে দামী দামী হীরা-জহরৎ, কাগজপত্র ও টাকা-পয়সা সব ভরে নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

সে কল্পনা করতেও পারেনি যে দীপকরা এত দ্রুত ফিরে আসবে। তাই সে

ভয় পায়নি মোটেই।

কোলকাতা থেকে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল উড়ে এলো তাদের হেলিকপ্টার।

তখন ভোর হয়ে আসছে। চারদিক ফর্সা হয়ে উঠছে।

ড্রাগন তার সঙ্গীকে নিয়ে কোলাকাতা শহর থেকে মাইল ত্রিশ চল্লিশ দূরে সমুদ্রের ধারে একটা সমতল জায়গায় হেলিকপ্টার থেকে নেমে পড়ল।

এপাশে দু'একটা উঁচু টিলা। জায়গাটা বেশ নির্জন। ওপাশে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে।

ড্রাগন ও তার সঙ্গী হেঁটে চলল পায়ে পায়ে। তারপর ড্রাগন বললে তার সঙ্গীকে—এখান থেকে কিছুটা এগিয়েই একটা নির্জন জায়গা আছে—সেখানে সহজেই আমাদের ব্যাগ ও সম্পদ লুকিয়ে রাখা যাবে।

—সেটা ভালই হবে। তার সঙ্গী স্বীকার করল কথাটা।

—আমার মনে হয়, এখানে আট-দশদিন আমাদের লুকিয়ে থাকা ভাল।

—ঠিক কথা।

তারা চারদিকে তাকাচ্ছিল—এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল যে তারা যেন বিস্ময়ে থ বনে গেল।

একটা হেলিকপ্টার উড়ে আসছে এদিকে, দেখতে পেলো তারা।

ড্রাগন বললে—ওটা কি?

তাইত দেখছি। এ সময়ে যে ওটা এদিকে আসবে তা ভাবতেই পারিনি।

—তাই ত বটে। ওটা কাদের হেলিকপ্টার?

কথা শেষ হলো না।

দেখা গেল দীপকও তার দলের দু'জন সশস্ত্র পুলিশ হেলিকপ্টারে বসে আছে।

ড্রাগনের সঙ্গী গুলি ছুঁড়ল। দীপকরাও পাল্টা জবাব দিল।

ড্রাগন বললে—হুঁশিয়ার!

—কি হয়েছে?

—আমাদের আগে পালাতে হবে এখান থেকে। যেমন করেই হোক।

—তার উপায়?

—ব্যাগটা ফেলে চল আমরা দৌড়ে গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

—তাই চলো।

ড্রাগন তাড়াতাড়ি দৌড়ে উঁচু জায়গা থেকে নেমে ছুটে চলল সাগরের দিকে। তার আগেই ব্যাগটা ফেলে দিল সেখানে।

দীপকের দল—অর্থাৎ দীপক ও তার সঙ্গী দু'জন পুলিশ অফিসার হেলিকপ্টার নামাল। তারপর সমতল জায়গাতে সেটা রেখে ড্রাগন ও তার সঙ্গীর দিকে ধাবিত হলো।

একটু এগিয়েই দেখা গেল সেই ব্যাগটা পড়ে আছে।

দীপক ব্যাগটা খুলে ফেলল।

তাতে বোঝাই টাকা ও বহু মূল্যবান হীরা-জহরৎ।

দীপক বললে—প্রাণের দায়ে ওরা এসব ফেলে গেছে মিঃ গুপ্ত।

—ঠিক বলেছেন।

—এখন কি করা যায়?

—চলুন ওদের পেছনে ধাওয়া করা যাক।

—তাই চলুন।

ওরা তিনজনে পিস্তল উদ্যত করে দ্রুত পায়ে ছুটে চলল সাগরের দিকে।

প্রাণপণে ছুটে চলল ওরা। একটু পরেই দেখা গেল—তাদের ছোটা বৃথা হলো।

ড্রাগন আর তার সঙ্গী ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বিশাল সাগরের বুকে।

দীপক বলল—কোথায় চললো ওরা?

—তা ত বোঝা যায় না।

—তবে চলুন দেখি।

—নিশ্চয়ই। চলুন দেখা যাক।

ওরা তিনজন যখন সাগরতীরে পৌঁছল তখন ড্রাগন আর তার সঙ্গী গভীর সাগরের মাঝ দিয়ে সাঁতার কেটে চলেছে।

মাঝে মাঝে ওরা ডুবে যাচ্ছে—আবার মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ওদের মাথা।

দীপক বললে—কি করা যাবে মিঃ গুপ্ত?

মিঃ গুপ্ত বললেন—আমরা ত পাগল নই।

—তার মানে?

—মানে এই তরঙ্গসঙ্কুল সাগরে নেমেছে যখন, তখন নিশ্চয় হাঙ্গর-কুমীরে ওদের খেয়ে ফেলবে। আমরা ত মিছিমিছি জীবন দিতে পারি না।

—তা ত ঠিকই।

—তাই চলুন আমরা ফিরে যাই। ড্রাগনের জীবনের আজই শেষ।

দীপক হাসল।

—হাসছেন যে মিঃ চ্যাটার্জী?

—হাসব না? ড্রাগন যেন বার বার মরেও বেঁচে ওঠে। তাই ও শেষ হয়েছে, নিজের চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস হয় না।

—তা বটে। তবু মালপত্রগুলো ত উদ্ধার করা গেল। এটাই লাভ।

—তা ঠিক।

ওরা আবার ফিরে চলল।

।। তেরো ।।

পরিশেষে

মহাসাগরের গর্ভে ড্রাগন বিলীন হয়ে গেছে এই কথা ভেবে সকলে নিশ্চিন্ত ছিল। এমন কি লালবাজারের পুলিশ রেকর্ডেও লেখা হয়ে গেল ঃ

বিখ্যাত দস্যু ড্রাগনের সাগরের মধ্যে অতল সমাধি! দস্যু ড্রাগন মৃত বলে পুলিশ বিভাগের ধারণা!

তার নীচে বিস্তৃত রিপোর্ট লেখা হয়েছিল। সব শেষে লেখা ছিল—দস্যু ড্রাগন মৃত বলেই আমরা মনে করেছি। কারণ সে যেভাবে সাগরের গর্ভে ডুবে গেছে তাতে আর বাঁচার কোনও প্রমাণ বা সন্দেহ আমাদের হয় না।

কিন্তু সবাই নিশ্চিন্ত থাকলেও নিশ্চিন্ত ছিল না। দীপক চ্যাটার্জী নিজে। সে ভাবছিল, কিছু একটা ঘটনা নিশ্চয় আছে এর পেছনে। ড্রাগন মরেনি—সে মরতে পারে না।

সেদিন সকালে এই বিষয় নিয়েই কথা হচ্ছিল দীপকের সঙ্গে মিঃ গুপ্তের।

মিঃ গুপ্ত বললেন—আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত যে ড্রাগন মারা গেছে।

দীপক হাসল। বললে—না, আমি ত কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না মিঃ গুপ্ত।

—কেন?

—কারণ ড্রাগন আগে থেকে নিশ্চিন্তভাবে না জেনে কোনও কাজ করে না। সে যে সাগরের তলে বিলীন হলো, তা সে ইচ্ছা করেই হয়েছে। আবার সে যখন নবরূপে দেখা দেবে তখন নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যাবে।

—তা হতে পারে। তবে কোনও অলৌকিক ঘটনা পুলিশ বিভাগ বিশ্বাস করে না।

দীপক বললে—তা আমি ভাল করেই জানি। তবুও আমি ড্রাগনের মৃত্যুর খবর করতে পারছি না। কেন, তা জানি না।

এমন সময়—

হঠাৎ ক্রিং ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠল।

—হ্যালো....কে কথা বলছেন?

—আমি মিঃ গুপ্ত কথা বলছি।

—জানি। আর একথাও জানি যে, ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জীও ওখানে আছেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে?

—আমার পরিচয় পেতে চান?

—নিশ্চয়ই।

—তবে শুনুন, আমি একজন মৃত মানুষ। প্রাচীন সমাধি থেকে উঠে এসেছি।

—তার মানে?

—মানে আমি যে জীবিত তা আপনারা বিশ্বাস করবেন না নিশ্চয়।

—বেশ, তা করব না। তবে এসব হেঁয়ালী ছেড়ে সত্যি কথা বলবেন কি?

—বেশ ত, বলব সত্যি কথা। আমি হচ্ছি বিখ্যাত দস্যু ড্রাগন।

—ড্রাগন!

মিঃ গুপ্ত যেন লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

দীপক বললে—ড্রাগন কথা বলছে?

—হ্যাঁ।

—বেশ, ফোনটা আমাকে দিন। আমি তার গলা শুনলেই চিনতে পারব তাকে।

দীপক রিসিভারটা নিল! তারপর বললে—কে তুমি? তুমি কি সত্যিই ড্রাগন?

—হ্যাঁ, সত্যি আমি ড্রাগন। আমার গলা শুনে কি তুমি বুঝতে পারছ দীপক চ্যাটার্জী?

—হ্যাঁ, আমি ঠিক চিনতে পেরেছি।

—কি চিনেছ?

—চিনেছি যে, তুমিই ড্রাগন। কিন্তু তুমি বিরাট মহাসমুদ্র থেকে রক্ষা পেলে কি করে বলো ত?

—হাঃ হাঃ হাঃ—

ড্রাগন হেসে উঠল। বললে—তুমি কি জানো না দীপক যে, ড্রাগনের কখনো মৃত্যু নেই।

—তার মানে?

—মানে ড্রাগন কখনো মরে না—মরতে পারে না। সে জীবিত আছে। আমার ব্যবস্থা করাই ছিল সাগরের তল দিয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত আশ্রয় নেবার।

—তা জানতাম আমি। কারণ তা না হলে তুমি ঝাঁপ দিতে না সাগরে ঠিক আছে। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করছি।

ড্রাগন বললে—তোমার সঙ্গে সত্বর আবার আমার সাক্ষাৎ হবে নতুন ঘটনার মাধ্যমে—নতুন পরিবেশে। আশা করি সেখানে হবে নতুন বুদ্ধির লড়াই।

দীপক কোনও উত্তর দিল না। ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

।। পাঁচ ।।

শত্রু হস্তে

বাড়ি ফিরে দীপক সবার আগে রায়সাহেবের সঙ্গে দেখা করল। তিনি তাকে দেখে বললেন—আসুন দীপকবাবু, কিন্তু সেদিন ত আপনার দেখাই পেলাম না।

এদিকে দস্যুরা কাজ শেষ করে চলে গেল।

রায়সাহেব সব বললেন, এমন কি পুলিশ কমিশনার সাহেব যে চেষ্টা করেও কোনও সূত্র বের করতে পারেননি তাও বললেন।

দীপক বললে—সত্যি, ওদের বুদ্ধি ও সাহস একেবারে অদ্ভুতপূর্ব। আর চিন্তা করবেন না—আমিও আপ্রাণ চেষ্টা করছি।—তাঁকে সাহস দিয়ে দীপক বাড়ি ফিরে ভাল করে নক্সাটা পরীক্ষা করতে বসে গেল। অনেক পরিশ্রম করার পর সে বুঝতে পারল যে, এটা ভুগর্ভস্থ কোনও বাড়ির একটা নক্সা মাত্র।এই বাড়ির উপরেও আর একটা বাড়ি আছে।

তখন দীপক ভাবতে লাগল—নিশ্চয় এটা ঐ জঙ্গলের মধ্যেকার বাড়ি। তার ঠিক নীচেও অমনি একটা বাড়ি আছে। দীপক ভেবে স্থির করল, গোপনে সেখানে গিয়ে সে জায়গাটা ভাল করে দেবার চেষ্টা করবে। তাকে দেখতে হবে তার অনুমান সত্যি কি না।

গভীর রাত্রি।

দীপক নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করছিল। হঠাৎ কিসের যেন শব্দে তার ঘুমটা ভেঙে গেল। সে ভাল করে তাকাল।

ঘরে কেউ নেই।

কিন্তু একি!

অন্ধকারের মধ্যে যেন আরও একটা গাঢ় চাপ চাপ অন্ধকার।

দীপক ভয়ে শিউরে উঠল! তার ঘরে তিনটি মূর্তি প্রবেশ করেছে।

প্রত্যেকের হাতে পিস্তল।

দীপক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই একজন বলে উঠল—খবরদার! নড়বার চেষ্টা করলেই মৃত্যু হবে!! গুলিতে মাথার খুলি উড়ে যাবে।

—কে তোমরা?

—ড্রাগনের লোক। কর্তার হুকুম, আজ তাঁর সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে যেতে হবে।

—কোথায়?

—তাঁর আড্ডায়।

লোকটার ইঙ্গিতে দু'জন এসে দীপককে বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে বহন করে নীচে নিয়ে যাওয়া হলো।

দীপকের হাত-পা ও মুখ বাঁধা থাকায় সে কোনও শব্দ করতে পারল না।

তা ছাড়া দীপক ইচ্ছা করেই চুপ করে থাকল। ওদের আড্ডা কোথায় তা তার দেখা দরকার ।

তাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে তোলা হলো একটা মোটরে।

সঙ্গে সঙ্গে মোটরটি পূর্ণ গতিতে ছুটে চলল রাজপথ দিয়ে।

হাত-পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় দীপক মোটরে বসে লক্ষ্য করল যে, গাড়িটা ক্রমে কোলকাতা শহর ছাড়িয়ে দ্রুতগতিতে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে এগিয়ে চলেছে।

তখন দীপকরে মনে আশা জাগল। তাহলে সম্ভবতঃ তার অনুমানই ঠিক । দস্যুরা তাকে তাদের আড্ডাতেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

তারা ক্রমে জঙ্গলের সেই স্থানে—যেখানে দীপক সেদিন দস্যুদের মোটরটা পড়ে থাকতে দেখেছিল, সেখানে উপস্থিত হলো। একজন বললে—দীপকবাবু মাপ করবেন, এর বেশি আর অপরিচিত কারো যাবার কোনও হুকুম নেই। এ-জন্যেই আপনার চোখ দুটি বেঁধে দিচ্ছি। এই কথা বলে দস্যুটি দীপকের চোখ বেঁধে দিল।

তারপর তারা দীপককে গাড়ি থেকে নামিয়ে তার হাত ধরে এগিয়ে চলল। তারা চোখ বেঁধে দিলেও হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে দিল।

দীপক হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য করল, তাকে কোনও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । তার কারণ, মাঝে মাঝে গাছের ডাল দেহে আঘাত করছিল। যা হোক, আধঘণ্টা এইভাবে চলবার পর দীপকের মনে হলো তারা কোনও পাকা রাস্তার উপর দিয়ে চলছে।

এইভাবে পাঁচ সাত মিনিট চলবার পর তারা দীপকের চোখ খুলে দিল। দীপক দেখতে পেলো যে, সে একটি সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরের একপাশে তক্তপোশ পাতা, তার উপরে কয়েকজন লোক বসে আছে। অন্য দিকে চেয়ার ও টেবিলটাকে ঘিরে আরও চার-পাঁচটি চেয়ার। চেয়ারে মুখোস ঢাকা একজন লোক বসে আছে।

লোকটি বললে—আসুন দীপকবাবু, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। আপনার সঙ্গে আমার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও আপনি আমার সঙ্গে অনেক সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমার নাম সকলে ড্রাগন বলেই জানে।

দীপক ড্রাগনের দিকে তাকিয়ে ভাল করে তাকে দেখল।

সত্যিই দেখবার মত চেহারা। মনে হয় বিরাট শক্তি আছে দেহে তার। দেখে অভিভূত হতে হয়। সত্যি দস্যুদলপতির মত চেহেরা।

দীপক বললে—আমাকে এখানে কেন এনেছেন তা জানতে চাই।

—আপনি আমার চিঠি পেয়েছেন নিশ্চয়। আমার বিরুদ্ধে আপনি যান, তা আমি চাই না। আমি এখন একটি আরও বড় কাজ করব, তাই এ সময় আপনাকে বন্দী থাকতে হবে, যদি আপনি আমার কথা শুনতে রাজী না হন।

—কি কথা?

—আমার এই সব কাজের সময় আপনি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকবেন।

—না। তা আমি পারব না।

—তা হলে আপনাকে বন্দী থাকতে হবে।

এই বলে ড্রাগন তার লোকদের কি যেন ইঙ্গিত করল। তারা তিনজন এসে দীপকের দুটি বাহু ধরল।

দীপক আচমকা তাদের দেহে প্রচণ্ড আঘাত করতেই দু'জন দুদিকে ছিট্‌কে পড়ল। তৃতীয়জনকে দীপক যুযুৎসুর একটি প্যাঁচে দূরে নিক্ষেপ করল।

সঙ্গে সঙ্গে আরও তিন-চারজন এসে তাকে আক্রমণ করল।

দেখতে দেখতে একটি মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু দীপক একা সাত-আটজনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। সে তখন বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করল।

তখন তারা তাকে বন্দী করে একটি কক্ষের মধ্যে আবদ্ধ করল।

।। ছয়।।

নদীবক্ষে

দীপককে যে ঘরের মধ্যে রাখা হলো সেটি খুব সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো। একটি খাটের উপর বিছানা পাতা—অন্য দিকে একটি টেবিল ও একটি চেয়ার পাতা। তাতে কিছু নেই।

দীপক বুঝতে পারল, তাকে কষ্ট দেওয়া দস্যুদের উদ্দেশ্য নয়। যেমন করে হোক, তাকে আটকে রাখাই এদের মূখ্য উদ্দেশ্য।

দীপক দেখল, ঘরে একটাও জানালা নেই। একটা মাত্র দরজা—তাও বন্ধ। মাথার উপরে একটা ঘুলঘুলি আছে। তা দিয়ে অনেক কষ্টেও একটা মানুষ বের হতে পারবে না। বাড়িটা খুবই পুরোনো—বোধহয় প্রাচীন যুগের কোনও আমীর বা ওমরাহের বাড়ি এটা।

ঘুম ভাঙতেই ঘুলঘুলি দিয়ে দিনের আলো এসে ঘরটি আলোকিত করে তুলল। দীপক দেখল ঘরের একপাশে সংলগ্ন একটা বাথরুম ও পায়খানা আছে।

দীপক প্রাতঃকৃত্য শেষ করল। একটু পরে একজন দস্যু এসে তার চা ও খাবার দিয়ে গেল। পেছনে পিস্তল হাতে দু'জন দস্যু তাকে পাহারা দিচ্ছিল দেখা গেল।

দীপক তাদের বললে—কি ব্যাপার তোমাদের?

একজন গম্ভীর কণ্ঠে বললে—আপনি কেমন আছেন তা দেখতে এসেছি আমরা। দেখছি কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না।

—না, অসুবিধা নেই। বন্দী লোকের পক্ষে এর চেয়ে সুবিধে আর কি হ'তে পারে?

—আপনি মাসখানেক এখানে থাকবেন। তারপর আমরা আন্তর্জাতিক যে

চক্রের সঙ্গে কাজ করছি তাদের সঙ্গে ভারত ছেড়ে যাব। যাবার আগে আপনাকে মুক্তি দেবেন সর্দার। আর যদি আমাদের পেছনে লাগবেন না, প্রতিজ্ঞা করেন ত কর্তা শীগ্‌গির মুক্তি দেবেন, আপনাকে চতুর্গুণ পারিশ্রমিকও দেবেন।

—দুঃখিত। আমি তা চাই না।

—তাহলে থাকুন এখানেই।

বলে তারা দরজা বন্ধ করে চলে গেল। দীপক খাবার খেয়ে পরবর্তী কর্মপদ্ধতি চিন্তা করতে লাগল।

এদের সন্ধান সে ঠিক পেয়ে গেছে। এখন তার কাজ শুধু এখান থেকে পালানো। দীপক সে বিষয়ে চিন্তা করতে লাগল।

ক্রমে বেলা দুপুর হলো। দস্যুরা তার দুপুরের খাবারও দিয়ে গেল। দীপক সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

সন্ধ্যা হলে সে অনেক কষ্টে তার খাটটি ঘুলঘুলির কাছে টেনে আনল। তার উপরে রাখল টেবিল—তার উপরে চেয়ার। এবার সে ঘুলঘুলির কাছে পৌঁছাল।

বহু পুরোনো বাড়ি। দীপক তার প্যান্টের গুপ্ত পকেটে রক্ষিত ছোট ছুরিটা ঠিক আছে দেখে সেটা বের করল। তারপর চুন সুরকি ধীরে ধীরে আলগা করতে লাগল। একটু পরে পুরোনো বাড়ির একটা ইট সে সরাতে সমর্থ হলো। তখন ঘুলঘুলি একটু বড় হলো। তারপর আর একটা ইট! এইভাবে একটি মানুষ বের হবার মতো ফাঁক হলো।

দীপক অতি কষ্টে ঘুলঘুলি দিয়ে দেহটা বের করে লাফ দিয়ে ঘরের পাশের গলিতে পড়ল।

গলির ওপাশে দু'জন পাহারাদার ছিল। তারা এদিকে ঘোরার আগেই দীপক বাইরের দিকের প্রাচীরের মাথায় উঠে বসল। তারপর এক লাফে গিয়ে পড়ল ওপারে।

সে প্রাচীরের উপরে উঠে ওপারে লাফ দেবার আগের মুহূর্তে প্রহরীরা তাকে দেখতে পেল। তারা ছুটে এলো। কিন্তু দীপক ততক্ষণে ওপারে পড়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে।

প্রহরীরা চিৎকার করে উঠল—বন্দী ভাগ গিয়া—জলদি আও—

আরও অনেকে ছুটে এলো।

তারা দরজা খুলে বেরিয়ে যখন দীপকের পেছনে ধাওয়া করল, তখন দীপক অনেক দূরে চলে গেছে ও প্রাণপণে ছুটে চলেছে।

কাঁটা জঙ্গল ভেদ করে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে দীপক ছুটে চলছিল ঠিক পাগলের মতো।

দস্যুরা তার পশ্চাদ্ধাবন করছে—তা বুঝতে তার কষ্ট হয় নি।

এইভাবে প্রায় দশ মিনিট ছুটে দীপক দেখল, সে গঙ্গার ধারে পৌঁছে গেছে। গঙ্গার তীরের কাছেই একটা মোটরলঞ্চ বাঁধা আছে দীপক আর কালবিলম্ব না

ক'রে লঞ্চে উঠে বসল।

এদিকে ড্রাগনের অনুচরেরা নদী পর্যন্ত ছুটে এলো।

দেখতে পেলো দীপক লঞ্চে উঠে পালাচ্ছে। তারা গঙ্গার কে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু দীপক লঞ্চে স্টার্ট দিয়েই পূর্ণগতিতে সেটা চালাল কোলকাতার দিকে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁতার কাটা সম্ভব নয়, বাধ্য হয়ে তারা ফিরে গেল।

ড্রাগন যে লঞ্চটা ঘাটে বেঁধে রেখেছিল সেটা আসলে একটা চোরাই লঞ্চ। অন্য দেশ থেকে সেটি এনে রং পাল্টে ড্রাগন ব্যবহার করছিল।

দীপক বড়বাজারে ঘাটে লঞ্চটা থামিয়ে সেটা জলপুলিশের হাতে জমা দিল। তারপর চলল সোজা লালবাজার হেড্ কোয়ার্টার্সের দিকে।

পুলিশ কমিশনার দীপকের কাছে সব কথা শুনে বললেন—আপনি তাদের অবস্থানটা কোন্ জায়গায় তা বুঝতে পেরেছেন?

—অনেকটা আন্দাজ করতে পেরেছি। আমি একবার নিজে গোপনে হানা দিয়ে দেখব—তারপর প্রয়োজন হলে আপনাদের নিয়ে যাব সেখানে।

—ঠিক আছে।

—দীপক উঠে দাঁড়াল।

।। সাত ।।

বিরাট ষড়যন্ত্র

ড্রাগন খবরটা শুনে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—কি বললে? বাঘের গর্ত থেকে ছাগলটা পালিয়ে গেল! অপদার্থের দল!

যে দু'জন পিস্তলধারী প্রহরী পাহারা দিচ্ছিল, তারা বললে—আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিনি স্যার। কিন্তু সে লঞ্চে করে পালিয়ে গেছে দ্রুতগতিতে।

—এতটা পথ সে চলে গলে—তোমরা কিভাবে পাহারা দিচ্ছিলে? তোমাদের দু'জনকে এক্ষুনি ঠাণ্ডা-ঘরে রাখার হুকুম দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আরও চারজন দস্যু এসে ঐ দু'জনকে ঠাণ্ডা ঘরে নিয়ে গেল। সেটা একটা ভয়ানক স্থানে—স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা ঘর সেটা। তার উপর কোমর অবধি বরফের মতো ঠাণ্ডা জল। সেখানে তাদের বন্দী করে রাখা হলো হাত-পা বেঁধে।

ড্রাগন তখন সঙ্গীদের বললে—তোমাদের তৈরী থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক চারজন বিখ্যাত দস্যু আজ এখানে আসবে।

—কেন কর্তা?

—বিরাট একটি কাজ আমি করতে চলেছি এদের নিয়ে। এই কাজগুলো

আমি করব—টাকার মোটা অংশ আমি নেবো, ওরা পাবে মাত্র সিকি অংশ। আমরা টাকাগুলো নিয়ে সোজা ভারত ছেড়ে চলে যাব ক'দিনের মধ্যেই।

—সে ত খুব ভাল কথা।

—হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে এই ক'দিনে আমাকে দশ-বিশ লাখ টাকার কাজ করতে হবে।

—বেশ, তা করা যাবে। আপনার কথামতো কাজ করতে আমরা রাজী।

একটু পরে চারজন বিদেশী লোক এলো সেখানে। তারাও বিদেশের খুব বড় ক্রিমিন্যাল, তা তাদের দেখেই বোঝা যায়।

তাদের সঙ্গে ড্রাগনের প্রায় আধঘণ্টা ধরে নানা চক্রান্ত হলো।

তারপর তারা বললে—তাহলে কাল থেকে প্রথম কাজ শুরু হোক।

—ঠিক আছে।

—আপনার উপর সব ভার দিলাম আমরা, যেন কোন অসুবিধা না হয়।

—ঠিক আছে—নির্ভাবনায় থাকুন।

—আর ভাগ-বাঁটোয়ারা?

—আমরা কাজ করব, নেবে বারো আনা—আর আপনার প্ল্যানের জন্য পাবেন চার আনা।

—দশ আনা ছ' আনা হ'লে হয় না?

—না। দেখুন সব দায়িত্ব ও রিস্ক ত আমার দলের।

—বেশ, তবে তাই হোক।

কথা শেষ করে বিদেশী দলবল চলে গেল।

ড্রাগন তার সঙ্গীদের বললে—এদিকের কাজ ঠিকমত হয়েছে। এখন শুধু ভয় ঐ দীপক চ্যাটার্জীকে।

—এবারে তাকে পেলে শেষ করে দেবেন।

—দেখা যাক। আর ঐ দু'জনকে কি মৃত্যু পর্যন্ত বন্দী করে রাখতে চাও তোমরা?

না কর্তা। ঠাণ্ডা গারদে খুব শিক্ষা ওদের হয়েছে—এবারে মুক্তি দিন।

—ঠিক আছে। তোমাদের যখন তাই ইচ্ছা তখন ওদের মুক্তি দাও।

দস্যু দু'জনকে ঠাণ্ডা-ঘর থেকে বের করে আনা হলো। তারপর ড্রাগন তার পরবর্তী কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে লাগল।

সম্পূর্ণ নির্দেশ শেষ হয়ে গেলে ড্রাগন বললে—একাজ তাহলে হবে প্রথম কাজ। কি বলো তোমরা?

—ঠিক আছে কর্তা।

আমি তাহলে এখন চলি।

ড্রাগন বেরিয়ে পড়ল তার আড্ডা থেকে।

।। আট।।

ডাকাতির পর ডাকাতি

সারাটা কোলকাতা শহরের বুকে তুমুল এক হুলস্থূল শুরু হয়ে গেল।

কোলকাতা শহরে পর পর একটির পর একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি, পোষ্ট অফিসে ডাকাতি, চলন্ত ট্রেনে ডাকাতি—একটি সপ্তাহের মধ্যে যেন বিশটা ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

প্রতিটি ডাকাতিই অদ্ভুত।

সব যেন একই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে পুলিশ বিভাগ তীব্রভাবে এই ঘটনার জন্যে জনসাধারণ তথা নানা পত্রিকার তরফ থেকে ধিক্কার লাভ করেছে।

সবাই একবাক্যে শুধু বলে চলেছে—পুলিশ বিভাগ নিষ্কর্মা হয়ে উঠেছে।

কিন্তু দোষ তাদের মোটেই নেই এ ব্যাপারে।

তার কারণ হলো, এমন অভিনব ধারায় দস্যুদল এই সব কাজ করে চলেছিল যে, তা বন্ধ করার কোন উপায় ছিল না।

একসঙ্গে চার-পাঁচজন দস্যু পিস্তল নিয়ে একটি কালো গাড়িতে চেপে হানা দিয়ে থাকে ব্যাঙ্কে। আরো চার পাঁচজন পিস্তল নিয়ে বাইরে পাহারা দেয়।

এক পক্ষ প্রথমে ভেতরে ঢুকে পিস্তল দেখিয়ে ব্যাঙ্কের প্রহরীর বন্দুক কেড়ে নেয় ও ক্যাশ লুট করে।

অন্য পক্ষ রাস্তায় লোকজন জমলে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে বা গুলি ছুঁড়ে তাদের সরিয়ে দেয়।

তারপর ভেতরের দল বাইরে টাকা নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা সেই সেই গাড়িতে চেপে অদৃশ্য হয়।

এইভাবে ডাকাতি চলতে লাগল কয়েক দিন পর পর একই ভাবে।

কোথাও পঞ্চাশ হাজার, কোথাও দেড় লক্ষ, কোথাও বা তিন-চার লক্ষ টাকা এইভাবে লুণ্ঠিত হতে লাগল।

তারপর শুরু হলো ট্রেন ডাকাতি। চলন্ত ট্রেন থামিয়ে কয়েকজন দস্যু একসঙ্গে যাত্রীদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয় পিস্তল দেখিয়ে। তারপর তারা চেন টেনে পলায়ন করে।

এইভাবে চলতে থাকল পর পর ডাকাতি লুণ্ঠন অব্যাহতভাবে।

সেদিন সকালবেলা।

দীপক দেখতে পেলো খবরের কাগজে আবার একটি খবর বের হয়েছে।

নিউ আলিপুরে ডাকাতি!

বিরাট ব্যাঙ্ক লুট ও রাহাজানি! দস্যুদলের পলায়ন!! পুলিশের ব্যর্থতা!!

এই নিয়ে কোলকাতা শহরে মোট দু'টি বড় বড় একই ধরনের ডাকাতি হলো। এবারেও দস্যুরা ঠিক আগের মতই লুট করে গাড়িতে চেপে পালিয়ে গেল। এবারেও পুলিশবাহিনী সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

ঘটনার সংবাদ পেয়ে কোলকাতা শহরের পুলিশ কমিশনার, ডি,সি,ডি,ডি, বি, প্রভৃতি সব বিখ্যাত নামজাদা অফিসার এসে জড়ো হন, কিন্তু কোনও কাজ উদ্ধার করতে পারেন না।

দিনের পর দিন এই শহরে এই সব চুরি-ডাকাতি যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে পড়েছে। কেন যে তা হচ্ছে তা আমরা জানি না।

আমাদের ধারণা কোনও বিরাট বিদেশী মাথা আছে এর পেছনে। এটা একটা আর্ন্তজাতিক চক্রান্ত। এর পেছনে কারা আছে?

আমরা চাই দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হোক। তা না হ'লে আমাদের দেশের পুলিশ বিভাগের এত দুর্নাম রটনা হবে—যার ফলে ভবিষ্যতে শৃঙ্খলা বলে দেশে কিছুই থাকবে না মনে হয়।

তাই আমাদের অনুরোধ যেন দ্রুত এইসব ডাকাতির সমাধানের জন্য

পুলিশ বিভাগ সক্রিয় হন।

খবরটা পড়ে দীপক চোখ নামাল।

বললে—এরা ত শুধু বড় বড় খবর ছাপিয়ে খালাস। তা ছাড়া কি আর করতে পারে?

—সত্যিই তাই। এরা খুবই ক্ষতি করছে।—রতন বললে।

কেন?

—খবরগুলো এত বড় করে ছাপবার কি দরকার বল ত?

দীপক হাসল। বলল—সত্যিই, আমাদের এতে বদনাম হচ্ছে। তাই না? কিন্তু কাগজওয়ালারা তাদের বিক্রি বাড়াবার চেষ্টা করবে না?

—তা করবে। কিন্তু এটা কাদের কীর্তি বল ত?

এ ত সহজ কথা। আর তার সঙ্গে ড্রাগন ত আছেই।

—ড্রাগন?

হ্যাঁ বন্ধু!

তা হ'লে কি করে ওদের ধরা যাবে?

—সে পথও ভেবেছি। আমাকে আগে একবার ওদের গোপন আড্ডাটা দেখে আসতে হবে। তারপর দেখা যাক, ধরতে পারি কি না ওদের।

রতন কোনও উত্তর দিল না।

দীপক একটু চিন্তা করল। তারপর বললে—খুব শীগ্‌গিরই আমরা ব্যবস্থা করছি।

—কোন্ পথে?

—পথটা জানাই আছে। শুধু কাজ শেষ করতে যা দেরি।

রতন বললে—এখন তা হ'লে প্রথম কোন পথ ধরে চলবি তাই বল্।

দীপক বললে—সেটা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার—পরে সব কথা জানতে পারবি।

—আশা করি তোমার অভিযান সফল হোক।

দীপক মৃদু হাসল।

রতন কোনও উত্তর দিল না।

।। নয়।।

বাঘের গুহায়

দীপক সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে মুসলমানের ছদ্মবেশে দস্যুর আড্ডার দিকে রওনা হলো।

যাবার সময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও নিজের মোটর নিয়ে যেতে ভুলল না।

যতদূর পর্যন্ত দস্যুরা তাকে চোখ খোলা অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল সেই পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছল।

তারপর বাগানের মধ্যে একস্থানে মোটরখানি লুকিয়ে রেখে তার সহকারী রতনকে গাড়িটা পাহারা দিতে বলে নিজে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সে দেখল, জঙ্গলের মাঝ দিয়ে একটা সরু পায়ে চলায় পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে। দীপক অন্য দিকে লক্ষ্য না করে সেই পথ ধরে এগিয়ে চলল।

প্রায় আধ ঘণ্টা চলার পর একটা পুরনো ভাঙা অট্টালিকা সে দেখতে পেলো। সে ভাল করে সেটার চারদিক দেখে পেছন দিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করল।

অন্ধকার নেমে আসছিল ধীরে ধীরে।

দীপক প্রথমে কোনদিকে যাবে তা স্থির করতে পারল না।

পরে টর্চ ফেলে সে দেখল, একটা সরু পথ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছে।

দীপক সেই পথ ধরে এগিয়ে চলল।

মহাশূন্যে ড্রাগন

।। এক ।।

বিভীষিকার মাঝে

কোলকাতা শহরে যেন হঠাৎ রাতারাতি একটা বিরাট অপরাধের কারখানায় পরিণত হয়েছে।

শুধু কোলকাতা শহর নয়—সারাটা বাংলাদেশের এই অবস্থা।

চারিদিকে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, আইন না-মানা, খুন-জখম, ডাকাতি, বোমাবাজি ইত্যাদি শুরু হয়েছে।

এ নিয়ে পুলিশ বিভাগ চিন্তিত। চিন্তিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থেকে দিল্লীর হোমরা-চোমরা মন্ত্রীরা পর্যন্ত।

সকলের মনেই এক প্রশ্ন।

এই সমস্যার সমাধান কি? কি করে এর প্রকৃত প্রতিকার করা যেতে পারে? এই বিষয় নিয়ে মন্ত্রীরা পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনও হদিশ বের করতে পারলেন না তাঁরা।

অবশেষে মন্ত্রীরা হতাশ হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

রাজ্যপাল নিজে শাসন-ব্যবস্থা হাতে নিয়ে অনেক চেষ্টা করলেন।

কিন্তু তিনিও অবশেষে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন।

তখন কড়া নোট আসতে লাগল উপর মহলের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে। এর প্রতিকার চাই। যেমন করেই হোক না কেন, সত্বর ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু ব্যবস্থার পথ কি?

পুলিশ বিভাগ ব্যর্থ হয়ে এবার ভাবতে শুরু করলো—দীপক চ্যাটার্জীর সাহায্য ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

সেদিন সকালবেলা।

দীপকের ঘরের টেলিফোন ঘন ঘন বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং শব্দে।

দীপক তার ল্যাবরেটরীতে বসে একটা রক্তের ছাপ পরীক্ষা করার কাজে ব্যস্ত ছিল। তার সামনে ছিল বীকার, টেষ্ট টিউব, নানা রাসায়নিক পদার্থ বুনসেন ফ্লেম ইত্যাদি।

হঠাৎ ফোন পেয়ে দীপক রিসিভারটা তুলে বলল—হ্যালো...কে?

—আমি মিঃ গুপ্ত বলছি।

—লালবাজার থেকে?

—হ্যাঁ।

—কি ব্যাপার?

বিশেষ কারণে পুলিশ কমিশনার স্মরণ করেছেন আপনাকে। অবশ্যই দয়া করে একবার এখানে এলে বাধিত হবো।

—বেশ ত, আমি শিগ্‌গীরই দেখা করছি।

দীপক রিসিভার নামিয়ে রাখল। তারপর পোশাক পরে তৈরী হচ্ছিল সে—এমন সময় রতনলাল প্রবেশ করল ঘরে।

—কি রে, বের হচ্ছিস নাকি?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

—লালবাজারের দিকে।

—বিশেষ জরুরী তাগাদা এসেছে বুঝি?

—ঠিক বলেছিস্। কি করে জানতে পারলি তুই?

—আন্দাজে বললাম।

—কি করে আন্দাজ করলি যে হঠাৎ আমি লালবাজারে যাব?

—কারণ দেশের অবস্থা যে কতটা জটিল তা কি আমি লক্ষ্য করিনি?

—জটিল?

—তা নয় ত কি? খবরের কাগজে খুললেই চোখে পড়ে এইসব ভয়ংকর খবর। সব সময় দেখা যাচ্ছে শুধু খুন, চুরি, ডাকাতি, পুলিশ হত্যা, জনসাধারণ হত্যা, নারীহরণ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি ঘটনা। তাই তোকে যে লালবাজারে জরুরীভাবে আহ্বান জানাবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

দীপক হাসল। বললে—তুইও যাবি নাকি?

—যেতে পারি। তবে বেশিক্ষণ ধরে মিঃ গুপ্তের সঙ্গে বক-বক করতে পারব না।

—তার মানে?

—মানে মিঃ গুপ্ত সবই বেশি বোঝেন—কেবল কাজের বেলা অষ্টরম্ভা।

দীপক বললে—ছিঃ, মিঃ গুপ্ত একজন সুযোগ্য অফিসার। তাঁর নামে এসব বলবি না।

বেশ, তবে বলব না। এখন চল্, কি ব্যাপার সেখানে ঘটেছে শুনে আসি।

দীপকের গাড়ী এসে থামল লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে।

দীপক মিঃ গুপ্তের সঙ্গে দেখা করল। তিনি বললেন—পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার, এমন কি রাজ্যপাল পর্যন্ত আজ খুব চিন্তিত দীপকবাবু।

দীপক হেসে বললে—সব জানি।

—জানেন সব!

—হ্যাঁ।

—তবে এ নিয়ে আগেই মাথা ঘামানো উচিত ছিল আপনার।

—না ঘামাইনি, তার কারণ ছিল।

—কি কারণ?

—আগে আমার ধারণা ছিল যে, এসব হলো বিক্ষিপ্ত ঘটনা মাত্র। সারা বাংলাদেশে নানাস্থানে এমনি কাণ্ড ঘটেই চলেছে। তাই এ ধারণাই করা স্বাভাবিক।

মিঃ গুপ্ত হাসলেন।

বললেন—আপনার কি ধারণা এসব নানান রাজনৈতিক দলের কীর্তি?

দীপক বললে—মাথা খারাপ।

—তার মানে?

—মানে রাজনৈতিক দল রাজনীতি করে। অবশ্য তা নিয়ে দু'এক জায়গায় ঝামেলা হওয়া অসম্ভব নয় মোটেই।

—তাহলে?

—প্রকৃত কথা হলো বিরাট একটি ক্রিমিন্যাল দল রাজনৈতিক দলের নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

—তার মানে?

—মানে তারা যা খুশী করছে—শুধু মুখে বলছে বা প্রচার করছে যে, তারা রাজনৈতিক দলের লোক।

—আপনার ধারণা সত্যি?

—মিথ্যা ধারণা চট্ করে আমি করি না জানবেন মিঃ গুপ্ত।

—তা বটে।

—তাছাড়া আর অনেক কথা আছে। রাজনৈতিক দলের এই সব নীচ অপরাধ করে কোনও স্বার্থসিদ্ধি হবে না। কোনও দেশেই কখনো তারা তা করেনি। তাই এটা চিন্তা করা স্বাভাবিক।

—একথা ঠিক। তবে কি আপনার ধারণা এসবের পেছনে আছে মাত্র একটি ব্রেণ?

—ঠিক তাই।

—কে সে?

দীপক বললে—সে কে তা জানি না আমি—তবে এটা জানি যে তাদের ধরতে হলে খুব সাবধানে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।

—তা ত বটেই। তবে তাহা যদি জানতে পারে যে, আমরা তাদের সন্দেহ করছি তবে তারা আরও সাবধান হয়ে যাবে।

—তাদের স্বার্থ কি?

—বিরাট দলবলকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জন করাই তাদের স্বার্থ।

—বুঝেছি। কিন্তু দলের সব লোক যে অর্থ পায় তার শেয়ার কি দলপতিকে দেয় তারা?

—নিশ্চয়ই দেয়—না দিলে দলপতি তা দিতে বাধ্য করে।

—এটা অবশ্য সম্ভব। আচ্ছা একটা কথা মিঃ চ্যাটার্জী—

—বলুন?

—কুখ্যাত দস্যু ড্রাগনের কীর্তি নয় ত এসব?

—না, তা মনে হয় না।

—কেন?

—কারণ ড্রাগনের কর্মধারা ভিন্ন। সে চলে অন্য পথে ধরে। সে নিরীহ বা গরীবের উপরে অথবা মধ্যবিত্তের উপরে অত্যাচার করে না। সে চায় কোটিপতিদের কাছ থেকে কিছু অর্থ ছিনিয়ে নিয়ে গরীবদের সাহায্য করতে।

—তা ত জানি।

—তাই ড্রাগন একাজ করছে না, তা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি। তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে—

—কি কথা?

—ড্রাগন মাত্র একমাস আগেও আমাদের সঙ্গে সংগ্রামে রত ছিল তা নিশ্চয় মনে আছে আপনার?

—তা আছে।

—তাই এত সত্ত্বর মহাসাগরের তলদেশ* থেকে উদ্ধার পেয়ে সে এত বিরাট দল গঠন করতে নিশ্চয় সক্ষম হবে না।

—এ কথাটা বিশ্বাস্য।

—তাই মিথ্যা কারও উপরে দোষ চাপিয়ে কোনও লাভ নেই। তাছাড়া ড্রাগন কখনও এত নৃশংস অত্যাচারী নয়।

—এটা আমিও স্বীকার করি।

—তাই আমার ধারণা এটা মোটেই ড্রাগনের কাজ নয়। আপনি-'এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন মিঃ গুপ্ত।

—তা ত হলো—এখন কোন্‌পথে আমরা এগোব তা বলুন দিকি।

—পথনির্দেশ আমি করতে পারব না, একথা ঠিক। কারণ এখনো সময় আসেনি। ঠিক সময়ে সবাই জানবেন। তবে শিগ্‌গীরই এ রহস্য ভেদ হবে।

—এ আশা করতে পারি তাহলে?

—তা অবশ্যই পারেন।

—তবে আর চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমি আশা করছি আপনার হাতে এই সব সমস্যার সমাধান হবে।

—আচ্ছা তাহলে চলি। গুড্‌বাই।

দীপক উঠে দাঁড়াল।

মিঃ গুপ্ত তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—উইশ ইউ গুড লাক মিঃ চ্যাটার্জি।

দীপক পথে নামল।

।। দুই।।

নৃশংস হত্যা

পরদিন সকাল।

দীপক চা পান শেষ করে নিত্যকার অভ্যাস মত খবরের কাগজের পাতা উল্টে চলেছিল।

একটা খবর তার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

কাগজে ছাপা হয়েছিল ঃ

আবার ভয়াবহ খুন!

লেকের ধারে একটি মৃতদেহ প্রাপ্তি! দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন!

নিহত লোকটির পরিচয় এখনও জানা যায়নি!

আততায়ী ধরা পড়েনি এখনো! চরম পুলিশী ব্যর্থতা!

দীপক খবরটা ভাল করে পড়ল।

পড়ে তার মুখের চেহারাতে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল।

দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকলে পুলিশ বিভাগের নামে ঘোর কলঙ্ক রটনা হতে থাকবে।

তাছাড়া এই দলটি এত কৌশলী আর হুঁশিয়ার যে, কখন কোথায় কি করবে তা কেউ আগে জানতে পারে না।

এমন কি কিছুদিন আগে কোলকাতার বুকে যে পর পর কতকগুলো ভয়ংকর ডাকাতি হয়ে গেল তাও এই দলের কীর্তি বলেই দীপকের নিজস্ব অনুমান।

দীপক ভাবল কিছুক্ষণ।

তারপর ফোন তুলে লালবাজারে মিঃ গুপ্তকে ডায়াল করল।

—হ্যালো....কে?

—আমি দীপক চ্যাটার্জী।

—আমি মিঃ গুপ্ত কথা বলছি। নমস্কার। কি খবর বলুন?

—আজকের কাগজের খবরটা পড়লাম। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন ত?

—তার মানে?

—মানে লোকটাকে তো আপনারা এখনো সনাক্ত করতে পারেননি?

—না। তবে চেষ্টা করছি।

—মৃতদেহটা কোথায়?

—এখনো সেটা অকুস্থলেই আছে। আমি যাচ্ছি তদন্তে। তারপর সেটা সরানো হবে।

—বুঝেছি। আচ্ছা আমিও যাচ্ছি লালবাজারে। দুজনে এক সঙ্গে বের হবো—কেমন?

—ধন্যবাদ! আমি আপনার জন্য ওয়েট করছি।

—থ্যাঙ্ক ইউ!

ফোন রেখে দিল দীপক।

দীপক সোজা এল লালবাজারে। তারপর পুলিশ ভ্যানে চেপে সে এলো ঘটনাস্থলে।

জায়গাটা ভেজা-ভেজা।

কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল—তাই লেকের ধারটা তখনো কর্দমাক্ত।

দীপক ভাল করে মাটিটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। তারপর বললে—দু'ধরনের পায়ের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে এখানে। গেছে আর ফিরে এসেছে। তাতে মনে হয় মৃতদেহ দুজন লোক বহন করে এনেছিল। দেখছেন না, পায়ের ছাপ কতো বেশি গভীর।

—তা ত দেখছি।

—দেখুন, মৃতের দেহ থেকে রক্ত কখনোই জমিতে পড়েনি। তার মানে রক্ত আগেই জমে গেছিল।

—ঠিক কথা।

—তাহলে সহজেই একথা বলা চলে যে, লোকটাকে খুন করে এখানে ফেলে যাওয়া হয়েছিল।

—তা বটে।

—তাছাড়া এই দেখুন এই পর্যন্ত মোটরের চাকার দাগ। মোটরে করে এই পর্যন্ত এসে তারপর মৃতদেহ দুজন লোকে বহন করে নিয়ে গেছিল।

—বুঝেছি।

—এখন এই পায়ের ছাপের মাপ নিতে হবে। তাছাড়া 'প্লাস্টার অফ প্যারিস' দিয়ে এর পূর্ণ ছাঁচটাও নিতে হবে।

—ঠিক কথা। তারপর দেখতে হবে মৃতদেহ সনাক্ত করা যায় কিনা।

—দ্যাট্‌স রাইট। বলে দীপক এগিয়ে যায় মৃতদেহটার দিকে।

ভাল করে তাকায় দীপক।

বলে—আরে, একে চেনেন না মিঃ গুপ্ত?

—না ত।

—এ ত রহিম খাঁ।

—কোন্ রহিম খাঁ।

—উত্তর প্রদেশের কুখ্যাত দস্যু ও গুণ্ডা, রহিম খাঁকে কে না চেনে।

—এতক্ষণে মনে পড়েছে বটে।

—এ ত বহুদিন ধরে সেই ইউ, পি-র খ্যাতনামা গুণ্ডা নবাব সিং-এর দলে কাজ করে চলেছিল।

—নবাব সিং!

—হ্যাঁ, তার নাম শোনেননি?

—মনে পড়ছে বটে।

—নবাব সিং-এর দল এককালে উত্তর প্রদেশের শ্রেষ্ঠ দল ছিল। তবে বছর চার পাঁচ আগে তারা যে হঠাৎ কোথায় গা ঢাকা দেয়, কেউ জানতেও পারে না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আর আজ দেখছি নবাব সিং-এর ডান হাত রহিম খাঁ নিহত।

—আশ্চর্য ব্যাপার ত!

—তা ঠিক। তবে সব ঘটনা বের করতে আমার দেরী হবে না মিঃ গুপ্ত! আমার মনে হয় কোনও দলের হয়ে নবাব সিং কাজ করছিল। তার ব্রেণ খুব পরিষ্কার ও ভয়ংঙ্কর। সে ছাড়া অন্য কারও এত ক্ষমতা নেই যে, সারা বাংলায় এমন এক ভয়ংকার অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

—আচ্ছা রহিম খাঁর সম্পূর্ণ ইতিহাস নিশ্চয় লালবাজারে আছে?

—ঠিক আছে।

—আচ্ছা আর বেশি ঝামেলা করে লাভ নেই। আপনি ছাঁচগুলো নিন আগে। তারপরে মৃতদেহটা পুলিশ মর্গে পোস্টমর্টেম করতে পাঠান।

—তা ত করতেই হবে।

দীপক বললে—আমি এখন চলি। আমাকে কয়েকটা কাজ সারতে হবে। আমি পরে বরং দেখা করব।

—ধন্যবাদ! আমাকে তাহলে উপস্থিত কাজগুলো করতে দিন।

মিঃ গুপ্ত তাঁর নিজের কাজগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

দীপকের মন তখন ছুটে চলেছিল অন্যদিকে।

সে ভাবছিল নবাব সিংয়ের কথা। লোকটা যখন কোলকাতায় আছে তখন যে ঘাঁটিতে সে থাকে, এখনও কি তাকে সেখানে পাওয়া যাবে?

দীপক গাড়ীতে উঠে দ্রুত গাড়ি ছুটিয়ে দেয়।

।। তিন।।

নবাব বনাম ড্রাগন

বেলা দুটো বেজে গেছে।

দীপকের তখনো খাওয়া হয়নি। সে লেক থেকে গাড়ি নিয়ে সোজা এসেছে পার্ক স্ট্রীটে।

পার্ক স্ট্রীটে ইয়োলো হোটেলে।

সুন্দর সাজানো হোটেলটা। দীপক জানে নবাব সিং কোলকাতায় এলে এখানেই ওঠে।

দীপক কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায়।

ম্যানেজার বলে—কাকে চান?

—আপনাকে চাই।

—আমাকে?

—হ্যাঁ।

—হঠাৎ কি কারণে? ঘরভাড়া চান নাকি আপনি?

—না।

—তবে?

—আমি চাই এখানকার একজন বোর্ডারের খবর নিতে।

—তার নাম?

—সঠিক নাম জানি না। তবে আগে লোকে তাকে বলত নবাব সিং।

ও নামে কেউ থাকে না এখানে।

—সত্যি বলছেন?

—মিথ্যা বলে লাভ কি? তাছাড়া আপনাকে ত আমি চিনিই না। কি ব্যাপার বলুন ত?

—আমি পুলিশের লোক।

—হতে পারেন।

—লম্বা, জোয়ান, ফর্সা একজন পাঞ্জাবী কি থাকে এখানে?

—এরকম দেখতে তিনজন লোক আছে। তাদের নাম নবাব নয়, তারা নবাবপুত্রও নয়। আপনি দেখুন খোঁজ করে।

—কত নম্বর ঘরে তাঁরা থাকেন?

—দোতলায় তিন নম্বরে আর সাত নম্বরে, তিনতলায় বারো নম্বরে।

—ঠিক আছে, আমি দেখছি।

দীপক উঠে যায়।

সোজা যায় সে দোতলায়।

—দোতলায় তিন নম্বর ঘরে দেখে একজন অ্যাংলো বুড়ি আর তার স্বামী থাকে। স্বামী অবশ্য তত বৃদ্ধ নয়—বয়স প্রায় চল্লিশ হবে। তবে স্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘ চেহারা।

দীপক দেখল এ লোকটা নবাব সিং নয়। সে বেরিয়ে এল নমস্কার করে। তারপর সাত নম্বর।

এখানে থাকেন একজন গুজরাট ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী আর দুটি সন্তান নিয়ে।

দীপক ভাল করে দেখল—না, এই লোকটাও নবাব সিং নয়।

দীপক রেগে গেল।

নবাব সিং কোথায় উধাও হলো চোখের নিমেষে?

তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

তিনতলায় বারো নম্বর ঘরে গিয়ে শুনতে পেলো সেখানে যিনি থাকেন তিনি তিন দিন ঘরে নেই। ঘরে আসেন না। কোথায় তিনি গেছেন, তাও কেউ জানে না।

দীপক ভাবল, বোধহয় সে আগের প্রোগ্রামমত বাইরে গেছে।

দীপক চিন্তিত হলো।

সেদিন সন্ধ্যা।

দীপক বাড়িতে ফিরেই পেলো একটা চিঠি। চিঠিটা যে এ সময় সে পাবে তা আশা করতেও পারেনি দীপক।

চিঠিতে লেখা ছিল ঃ

মাননীয় দীপক চ্যাটার্জি সমীপেষু—

আপনার সঙ্গে যদিও চিরদিন আমার সংঘাত চলে আসছে, তবু আপনার বিরাট ক্ষমতাকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করি।

বর্তমানে ভারতের তথা বাংলার বুকে এমন একজন বিরাট ক্রিমিন্যালের আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের তুলনায় আমিও নিতান্ত নগণ্য।

তার কারণ হলো—আমি জীবনে তাদের মত নৃশংস হতে পারব না, তাদের মত ভয়াবহ হতেও পারব না।

আমার পথ হলো ধনীর অর্থ ছিনিয়ে নিয়ে গরীবদের বিতরণ করা। কিন্তু এই দস্যুদল গরীব এবং মধ্যবিত্তদের উপর অত্যাচার করেই আনন্দ পায়।

তাই তাদের আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি একথা জেনে রাখবেন।

আমি চাই এই দল ধরা পড়ুক এবং উপযুক্ত শাস্তি তারা লাভ করুক।

এদের দলের নবার সিং-এর বিরুদ্ধে আপনি যে অনুসন্ধান করেছেন তা আমি জানি। তবে নবাব সিং অতি সামান্য।

এদের দলে আছে কয়েকজন অতি নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন ধনীলোক।

সেই সঙ্গে আছে কয়েকজন বিজ্ঞানী যারা গোপন আবিষ্কার দ্বারা সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

রহিম খাঁকে ওরা হত্যা করেছে নবাব সিংকে দুর্বল করার জন্যেই। এমন কতো হত্যা, কতো ডাকাতি যে ওরা করেছে কেউ কল্পনা করতেও পারবে না।

তাই আমি চাই যে, এই দল ধরা পড়ুক—এদের কর্মদক্ষতা স্তব্ধ হোক।

ইতি—

আপনার বিশেষ বন্ধু ও শত্রু

ড্রাগন

চিঠিটা পড়ল দীপক।

কয়েকবার ভাল করে চিঠিটা পড়ে সে বুঝতে পারল সব কথা।

এই বিরাট দলের বিরুদ্ধে ড্রাগন যে অবতীর্ণ হচ্ছে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সে এটাই কল্পনা করেছিল। ড্রাগনের মত দস্যু যে এই বিরাট আলোড়নের মধ্যে চুপ করে বসে থাকবে না। এটা সহজেই বোঝা যায়।

দীপক চিঠিটা টেবিলের উপর রাখল। এমন সময় রতনলাল প্রবেশ করল ভেতরে।

চিঠিটা পড়ে সে বলল—তাহলে এবার ঘটনা বেশ জমে উঠল দেখছি।

—তা ত বটেই।

—দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াও এই ঘটনাচক্র।

দীপক হেসে বললে—যাই হোক, একথা ঠিক যে, জয় শেষ পর্যন্ত আমাদের হবেই। তবে ঘটনাচক্র যে বেশ জটিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রতন কোন উত্তর দিলে না।

।। চার।।

মিলিওনেয়ার মিঃ বাসু

কোলকাতা থেকে পাঁচ মাইল দূরে শহরতলী অঞ্চলের একটা ঘর—মাটির নিচে ছোট ঘরটার অস্তিত্ব এই অঞ্চলের কেউ জানে না।

পোড়ো বাড়ি—অনেকে বলে ভূতের বাড়ি। কিছুদিন হল বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন একজন ধনী ব্যবসায়ী ভদ্রলোক।

সকলেই তাকে চেনে। দেখেছে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে অনেকে। অবশ্য দিনের বেলায় খুব বেশি লোক আসে না—আসে রাতের বেলায় বেশি লোক।

সেদিন রাত দশটা।

দু'জন লোককে ঢুকতে দেখা গেল বাড়িটার মধ্যে। দু'জনের পোষাকই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর।

তার আগে আরও দু'তিনজনকে এখানে ঢুকতে দেখা গেছিল।

যাই হোক দু'জনে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে একটা সিঁড়ি দিয়ে নামল।

মাটির নিচে একটা ঘর।

সেখানে দু'জনে প্রবেশ করে দেখল তাদের আগে আরও তিনজন এসে বসে আছে।

কোনও কথা নেই কারও মুখে!

মিনিট পাঁচ-ছয় চুপচাপ বসে থাকল ওরা। কেউ কোনও কথা বললে না।

এমন সময়—

একজন স্যুটপরা লোককে উপর থেকে নিচে নামতে দেখা গেল।

তার পরনে স্যুট। মুখে মুখোস।

তাকে দেখে সকলে সসম্মানে উঠে দাঁড়াল।

লোকটি বললে—বস তোমরা।

—আচ্ছা সর্দার!

—শোন, তোমাদের উপরে একটা বিশেষ জরুরী কাজের ভার দিতে চাই। আশা করি তোমরা তা পালন করতে পারবে।

—কি কাজ, বলুন।

—তোমরা জান বিখ্যাত ধনী মিলিওনেয়ার মিঃ বাসুর নাম?

—হ্যাঁ, সর্দার। কিন্তু তিনি আজ ঋণের দায়ে কারাগারে আছেন। তিনি আজ সর্বস্বান্ত হয়ে ভিখারীতে পরিণত হয়েছেন।

—ঠিক কথা। কিন্তু কেন আজ তাঁর এই অবস্থা তা কি জান তোমরা?

—না।

—তিনজন লোকের চক্রান্তে আজ তাঁর এই অবস্থা। তাদের নাম হলো ডাঃ অমর বসু, শেয়ার ব্রোকার বিনয় পালিত আর বিখ্যাত ধনী ধরমচাঁদ।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলছি। তারা শেয়ার মার্কেটে টেনে নিয়ে যায় মিঃ বাসুকে। তারপর নানা কৌশলে তাঁকে সর্বস্বান্ত করে। এর আগেও অনেকের তারা এইভাবে সর্বনাশ করেছে।

—এর কারণ কি, স্যার?

—কারণ হলো অপরের অর্থ আত্মস্যাৎ করা। এইভাবে অর্থ আত্মস্যাৎ করেই আজ তারা ধনী। তারাই আজ সারা দেশের বুকে অন্যায় কাজ করে চলেছে একের পর এক।

—এর মূলে তারা?

—হ্যাঁ, তোমরা নবাব সিংয়ের নাম নিশ্চয় শুনেছ?

—হ্যাঁ, স্যার।

—এই নবাব সিং হলো তাদের ডান হাত। নবাব সিংকে দিয়ে যেসব ক্রাইম করানো হয়, তার মেরুদণ্ড হলো এই তিনজন লোক। তাই নবাব সিং-এর দল আজ ছড়িয়ে আছে সারা দেশে।

—এত বড় ভয়াবহ লোক ওরা?

—হ্যাঁ। তাই আমি চাই এদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে।

—সে ত খুবই ভাল কথা। আমরা মনে-প্রাণে, আপনার আদেশ পালন করব স্যার।

—ঠিক আছে। তবে একট কথা—

—বলুন সর্দার?

—তোমরা জান যে, ড্রাগনের কথা যে অমান্য করে বা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার শাস্তি কি হয়?

—জানি স্যার, আপনি তার মৃত্যুদণ্ড দিয়ে থাকেন।

—ঠিক আছে। কথাটা যেন সব সময় মনে থাকে।

—নিশ্চয়ই থাকবে, স্যার।

ড্রাগন উঠে দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়।

পরদিন সকালবেলা।

প্রতিটি কাগজে যে খবরটা ছাপা হলো তা সারা কোলকাতা মহানগরীকে চঞ্চল করে তুলল।

তা হলো—

বিখ্যাত ধনী ও শেয়ার ব্রোকার বিনয় পালিত অদৃশ্য!
নিজস্ব বাসভবন থেকে আকস্মিক অন্তর্ধান!
আততায়ীর কোনও সংবাদ আজও পাওয়া যায়নি!

খবরটা কাগজে বেশ বড় অক্ষরে বের হয়েছিল।

খবরটা পাঠ করেছিলেন মিঃ গুপ্ত আর দীপক উভয়েই।

দীপক খবরটা পড়ে যেন বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে যায়।

এটা কার কীর্তি?

এটাও কি তবে নবাব সিং আর তার দলের কাজ?

মিঃ গুপ্তের সঙ্গে দেখা করে দীপক। উভয়ে যায় তদন্ত করতে যাতে ব্যাপারটার দ্রুত একটা ব্যবস্থা হয়।

কিন্তু মিঃ গুপ্তের সঙ্গে দেখা করে দীপক বেশ হতাশ হয়ে পড়ে।

মিঃ গুপ্ত বলেন—এ ব্যাপারটা যত সহজ মনে করছেন তা নয় কিন্তু!

—কেন?—দীপক প্রশ্ন করে।

—এতে ড্রাগনের হাত আছে।

—ড্রাগনের?

—হ্যাঁ। কারণ, অন্যদিনের মতোই মিঃ পালিত দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে শুয়েছিলেন। তারপর কেউ তাঁকে বিরক্ত করেনি। ভোরবেলা উঠে দেখা যায়, তাঁর ঘরে তিনি নেই। তাঁর পরনে ছিল নাইট ড্রেস। এমন কি পায়ের স্লীপার অবধি ঠিক ছিল। কেবল তিনিই নেই।

—এ কি করে সম্ভব?

—জানি না—তবে তা সম্ভব হয়েছে। তাই আমরা খুব চিন্তিত হই। তাঁর ঘরে ড্রাগনের কার্ড পড়েছিল বলে আমরা বুঝতে পারি যে, একাজ ড্রাগনের দলের।

—অদ্ভুত কাণ্ড!

—সত্যি, ঘটনাটা অদ্ভুত। কিন্তু একটা কথা আমরা জানি, তা হলো দস্যু ড্রাগন বিনা কারণে একাজ করেনি।

—তার মানে?

—জানেন ত মিলিওনেয়ার মিঃ বাসুকে যারা সর্বস্বান্ত করেছিল তাদের মধ্যে বিনয় পালিত একজন।

—তা জানি।

—ড্রাগন লিখেছে যে, তাদের উপরে সে প্রতিশোধ নিতে চায়।

—আশ্চর্য ত!

—হ্যাঁ। তা ছাড়াও এই ব্যাপারের সঙ্গে আরও অনেক বিরাট ঘটনাচক্র জড়িত আছে যা আমরা কল্পনা করতেও পারি না।

দীপক আর কোনও কথা বলে না।

সে শুধু চিন্তা করতে থাকে ঘটনাচক্রের গতি কোন্ পথে চলেছে।

।। পাঁচ।।

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন

মিঃ পালিত নিশ্চিন্তে রাতের বেলা তাঁর বেডে ঘুমিয়েছিলেন।

ভোরবেলা তাঁর ঘুম ভাঙল।

তিনি জানতেও পারেননি কে বা কারা তাঁর বাড়িতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তাঁকে অজ্ঞান করে তুলে নিয়ে এসেছে।

তাঁর জ্ঞান ফিরল। তিনি উঠে দেখেন যে, তিনি একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ

ছোট ঘর। তাঁর হাত পা বাঁধা।

তিনি বললেন—আমি কোথায়?

ছ'জন লোককে দেখা গেল তাঁর দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে।

একজনের হাতে একটা পিস্তল, অন্যজনের হাতে ছোরা।

মিঃ পালিত বললে—কে তোমরা?

তারা হেসে উঠল।

—কথা বলবে না?

—কেন বলব না? মিঃ বাসুকে যারা আজ সর্বস্বান্ত করেছে, তাদের সঙ্গে কথা না বলে কি থাকতে পারি?

—তা নয়। তোমরা কেন আমাকে এমনি বে-আইনিভাবে আটক করেছ?

—করব না? তোমরা হচ্ছো জানোয়ারের জাত। তোমরা তিনজন—দু'জনকে ধরে আনতে এখনো বাকি আছে।

—আমাদের ধরে এনে তোমাদের কি লাভ বলো?

—লাভ নিশ্চয়ই আছে। আগে বলো যে, মিঃ বাসুর সব শেয়ার আর টাকা পয়সা কোথায় আছে?

—আমরা তার কি জানি?

একজন বললে—মুন্না, ওর কানটা কেটে দে ত আগে।

—কান কাটতে হবে?

—হ্যাঁ, তা না হলে মুখ দিয়ে কথা বের হবে না।

—বেশ, তবে তাই হোক।

একজন এগিয়ে গিয়ে তাঁর কানটা ধরে কাটতে উদ্যত হয়।

মিঃ পালিত চীৎকার করে উঠেন—চুপ করো তোমরা।

—চুপ করব?

—হ্যাঁ। আমি সব বলছি।

—বেশ, সব বল।

—শোন, মিঃ বাসুর সব শেয়ার আছে আমার অফিসের সিন্দুকে।

—চাবি কোথায়?

—চাবি নেই। তবে কোড নম্বর আছে?

—কি সে নাম্বার?

—২৩৭৫।

—বেশ, তোমাকে মারলাম না। তোমার কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হলে তুমি বেঁচে যাবে। তা না হলে প্রাণ দিতে হবে।

সকলে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যায় হাসতে হাসতে

মিঃ পালিত বন্ধ ঘরে বসে অন্তিম মুহূর্তের কথা ভাবতে থাকেন।

এদিকে সারা কোলকাতা শহরে যেন আলোড়ন শুরু হয়ে যায়।

কাগজে কাগজে বের হতে থাকে খবর ঃ

মিঃ পালিতের অফিসের সেফ ভোল্ট থেকে দশ লক্ষ টাকার শেয়ার ও বিশ হাজার টাকা নগদ উধাও।

কে অপরাধী তা এখনো ধরা পড়েনি।

পুলিশবাহিনীর শোচনীয় ব্যর্থতা!

এই পর্যন্ত বের হয়েছিল। কিন্তু এর বেশি চলল জল্পনা-কল্পনা।

মোট কথা হলো সেই একই—তা হলো পুলিশ বিভাগের নানারকম কেচ্ছা।

পুলিশ বিভাগ যে দিনের পর দিন একেবারেই অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে, বারবার এই কথাটা প্রচার করেই কাগজওয়ালারা আনন্দ পায়।

তবে দীপক বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারে যে, এ হলো ড্রাগনের কীর্তি। কারণ, এর আগে ড্রাগনের লেখা চিঠিতে সে এমনি ঘটনার ইঙ্গিত পেয়েছিল।

ডাঃ অমর বসু সেদিন দুপুরের দিকে একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছিলেন ব্যারাকপুরের দিকে।

তিনি এখন সর্বদা সতর্ক। বিশেষ করে বিনয় পালিতের অন্তর্ধান ও ড্রাগনের নাম শুনে তাঁর ভয় আরও বেড়ে গেছে।

তিনি নবাব সিংকে এখবর জানিয়েছেন।

নবাব সিং বলেছে—আমি ত এখন কিছু করতে পারছি না। কারণ, ড্রাগনের খবর এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কেউ বের করতে পারে না। তবে তোমাদের রক্ষা করার চেষ্টা আমি করব।

—কি করে করবে?

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

—আর রিসার্চ কতদূর?

—বৈজ্ঞানিক ডাঃ সেন বলেছেন যে, রিসার্চ শেষ করতে আর দেরি নেই। যদি তাঁর রিসার্চ সফল হয় তা হলে আমাদের ক্ষমতা পৃথিবীর বড় বড় মহাশক্তির থেকেও বেড়ে যাবে। কারণ, আমরা অতি সহজে তখন মহাশূন্য যানের অধিকারী হব, যা বর্তমান মহাকাশযানের চেয়ে অনেক বেশি গতিসম্পন্ন হবে। তাতে করে আমরা শুধু গ্রহ নয়—সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে অন্য নক্ষত্র ও তাদের উপগ্রহেও অভিযান করতে পারব। তা ছাড়া মহাকাশে আমরা অন্য রকেটকে ধ্বংস করার ক্ষমতাও অর্জন করব।

নবাব সিংয়ের স্বপ্ন সফল হবে কিনা তা ডাঃ অমর বসু জানেন না। তবে তিনি আজ বিশেষ চিন্তিত ছিলেন বিনয় পালিতের আকস্মিক অন্তর্ধানের জন্যে।

তিনি বেশ ভাল করেই জানেন ড্রাগনের দলের ক্ষমতার কথা। তাদের অসাধ্য কাজ বোধ হয় এ দুনিয়ায় কিছু নেই।

ড্রাগন তাই একটা বিরাট দুঃস্বপ্ন হয়ে তাঁদের মনে বিরাজ করছিল।

।। ছয়।।

সংঘাত

ডাঃ অমর বসুর গাড়িটা ছুটে চলেছিল পূর্ণতম গতিতে।

হঠাৎ গাড়ির গতি কমে এলো। কারণ, দেখা গেল তাঁদের পাশ দিয়ে আর একটা গাড়ি বিপজ্জনক গতিতে ছুটে চলেছে। সেটা তাঁদের গাড়ির পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

ডাঃ বসু ড্রাইভারকে বললেন—লোকটা উন্মাদ নাকি? এত যানবাহন বহুল পথে কি এত জোরে কেউ গাড়ি চালায়?

—না, তা চালায় না, স্যার।

—আমারও ত তাই ধারণা।

—হয়তো কোনও জরুরী কাজ আছে বলে বাধ্য হয়ে এইভাবে ছুটে চলেছে।

—তা হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস কি তুমি লক্ষ্য করেছিলে ড্রাইভার?

—কি, স্যার?

—গাড়িটাতে মোট চার-পাঁচজন লোক বসেছিল। তাদের চেহারা খুব ভদ্র প্রকৃতির বলে মনে হলো না।

—তা বটে।

এমন সময় হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্যে ওরা কেউ তৈরি ছিল না।

যে গাড়িটা পূর্ণতম গতিতে এগিয়ে সেটা হঠাৎ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে পথটা আটকে দিল।

ডাঃ বসুর ড্রাইভার সেখানে এসে হেঁকে বললে—এই গাড়ি সরাও। এভাবে পথ আটকালে কেন?

কথা শেষ হল না।

ও-গাড়ি থেকে চারজন লোক লাফ দিয়ে নেমে ডাঃ বসুর গাড়ির দিকে এগিয়ে আসে।

তাদের দু'জনের হাতে পিস্তল—বাকী একজনের হাতে লোহার ডাণ্ডা—আর একজনের হাতে হাতবোমা।

দুম্!

মাঠের মধ্যে একটা হাতবোমা ছুঁড়ে মেরে লোকটা প্রমাণ করল যে, তারা খুব

শক্তিশালী।

ডাঃ বসু ভয় পেলেন। চীৎকার করে উঠলেন—এই, কি চাও, তোমরা?

—চুপ কর্ হতভাগা! বেশি চেঁচালে ফিনিশ করে দেবো।

—কে তোমরা?

—সেটা একটু পরেই জানতে পারবে। নেমে এস গাড়ি থেকে।

ডাঃ বসু নামতেই তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে ড্রাগনের লোকেরা।

তারপরে বলে—চলো শ্যাঙাং—একটু পরেই বুঝবে আমরা কে। আমরা হলাম তোমাদের রাতের দুঃস্বপ্ন ড্রাগনের দলের লোক।

—তোমরা ড্রাগনের দলের লোক?

—হ্যাঁ।

—কি চাও তোমরা?

—তা আমাদের দলপতির মুখে শুনবে। এখন চুপ করো।

ডাঃ বাসুকে তাদের গাড়িতে তুলে নিল লোকগুলো।

গাড়ি ফিরে চলল আবার কোলকাতার দিকে পূর্ণ গতিতে।

পথে একজন লোক একটা রুমাল চেপে ধরল ডাঃ বসুর মুখে।

একটা মিষ্টি গন্ধ ডাঃ বসু ধীরে ধীরে জ্ঞান হারালেন।

জ্ঞান ফিরল প্রায় তিন ঘণ্টা পরে।

তখনও মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে।

ডাঃ বসু তাকালেন।

অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে একটা ঘরে তিনি তখন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুয়েছিলেন।

চারদিকে কেউ নেই। এমন ঘর যে কোলকাতা শহর বা শহরতলীতে আছে বা থাকতে পারে, তা কল্পনা করতেও পারেন না ডাঃ বসু।

ক্ষীণকণ্ঠে ডাঃ বসু বলে উঠলেন—জল চাই—একটু জল—কে আছো?

কোন উত্তর নেই।

আবার বলে উঠলেন তিনি—একটু জল—

সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘ্যাঁচ করে শব্দ হলো।

পাশের দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল তিনজন লোক।

একজনের হাতে ঠাণ্ডা জল। অন্য দু'জনের হাতে পিস্তল আর ছোরা।

জলপাত্র যার হাতে ছিল সে জল খেতে দিল। ডাঃ বসু জলটুকু খেয়ে নিলেন।

জলপাত্রধারী লোকটা এবারে বললে—জ্ঞান ত দেখছি বেশ ফিরেছে।

—তা বটে।—বলে ছোরাধারী।

—তাহলে আমি যাই?

—হ্যাঁ তুমি চলে যাও।

জলপাত্রধারী বেরিয়ে গেল। এবারে ছোরাধারী বলে উঠে—মুখ খুলবে কি তুমি—না টুকরো টুকরো করে কাটতে হবে?

ডাঃ বসু বললেন—আমার অপরাধ?

—তোমার অপরাধের সীমা-সংখ্যা নেই।

—তার মানে?

—মানে জান না? আমাদের চেনো না? আমরা হচ্ছি ড্রাগনের দলের লোক। ধনীর পিঠের চামড়া নিয়ে আমরা নিপীড়িত, গরীবের পায়ের জুতো তৈরি করি। বুঝলে?

ডাঃ বসু কেঁপে উঠলেন। কোনও কথা বের হলো না তাঁর মুখ দিয়ে।

—শোন ডাঃ অমর বসু। মিলিওনেয়ার মিঃ বাসুর নাম শুনেছ? শুনেছি তিনি নাকি তোমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়?

—ঠিক কথা। তাঁর নাম জানি।

—তাঁর সর্বনাশ করেই আজ তোমরা এত ধনী হয়েছ, একথা ত ঠিক?

—তাঁর মানে?

—মানে স্বীকার করতে রাজী নও? বেশ, তা হলে রাজী করাতে হবে। হরবক্স, এই লোকটার নাক আর কানদুটো আগে কেটে নে ত। তারপর একে একে হাত পা সব কাটা হবে।

সঙ্গে সঙ্গে হরবক্স পিস্তলটা কোমরে রেগে বিরাট একটা ধারালো ভোজালি নিয়ে এগিয়ে গেল ডাঃ অমর বসুর দিকে।

অমর বসু আর্তনাদ করে উঠলেন—নাম-ধাম সব বলছি। কি, জানতে চাও তোমরা?

—সব আগে বল মিঃ বাসুকে তোমরা তিনজনে মিলে সর্বস্বান্ত করেছ কি না?

—হ্যাঁ।

—তার কত টাকা তোমরা আত্মসাৎ করেছ?

—নগদ প্রায় চার লক্ষ টাকা আর দশ লক্ষ টাকার শেয়ার।

—শেয়ারগুলো কি হলো?

—আমরা তিনজনে তা ভাগ করে নিয়েছি।

—ঠিক আছে। সেগুলো আছে কোথায়?

—আমার অংশের শেয়ারগুলো আমার অফিসের সেফ ভোল্টে আছে।

—চাবি আছে, না কম্বিনেশন তালা?

—কম্বিনেশন লক।

—সত্যি বলো কম্বিনেশনের সংকেত কি? মিথ্যা বললে, বুঝেছ ত—

—হ্যাঁ, আর ভুল করব না। কম্বিনেশন সংকেত হলো 'লাকি সেভন্'।

—ঠিক ত?

—মিথ্যা বলছি না।

—নবাব সিং-এর ঠিকানা জান?

—শুনেছি সে পার্ক স্টীটের ইয়োলো হোটেলে থাকত। এখন থাকে না তবে মাঝে মাঝে সেখানে সে ছদ্মবেশে যায়।

—ঠিক আছে, আমরা তাকে খুঁজে নেব। এবারে বল, বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ডাঃ সেন কোথায় থাকেন?

—জানি না।

—আবার মিথ্যা কথা? এর ফল কিন্তু খুব খারাপ হবে।

বলেই লোকটা ডাঃ বসুর একটা কান ধরে টান দিয়ে ছোরা দিয়ে সেটা কাটতে উদ্যত হয়।

—দাঁড়াও বলছি।

—সত্যি করে বল সব কথা।

—ডাঃ সেন থাকেন অশোকনগর থেকে তিন মাইল দূরে একটা মাঠে। সেখানে তিনি একটা বাড়ি আর বিরাট ল্যাবরেটরী তৈরী করেছেন।

—ঠিক বলছ ত?

—মিথ্যা বলে আমার কোনও লাভ নেই।

—ধন্যবাদ। আমরা আগে পরীক্ষা করে দেখব তুমি সত্যি কথা বলছ কিনা। সত্যি বললে মুক্তি পাবে—অবশ্য কাজ মিটে যাবার পর। আর মিথ্যা বললে বিপদ নিশ্চিত।

ডাঃ বসু কোনও কথা বললেন না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি ভাবতে থাকেন এর পরে আবার কোন্ বিপদ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে।

ওরা বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

ডাঃ বসু বললেন—একটা কথা ভাই।

—কি কথা?

—বিনয় পালিতও কি তোমাদের হাতেই পড়েছে নাকি?

—হ্যাঁ। সেও সব কথা স্বীকার করেছে। তার শেয়ারগুলো আমরা ফেরৎ পেয়েছি।

—ঠিক আছে। তোমাদের উদ্দেশ্য কি সেটাই শুধু বুঝতে পারছি না।

—সব বুঝবে। আমাদের উদ্দেশ্য যে চিরদিনই মহৎ তা জেনে রেখো। তারা দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

।। সাত ।।

দীপকের অভিযান

সেদিনের খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল নতুন খবর ঃ—

চলন্ত প্রাইভেট কার থেকে বিখ্যাত ধনী ডাঃ অমর বসু উধাও। ড্রাগনের চক্রান্ত বলে সন্দেহ। কারণ এখনও জানা যায়নি।

দীপক খবরটা পড়েই সোজা এলো লালবাজার পুলিশ অফিসে।

মিঃ গুপ্ত বললেন—খবরটা দেখেছেন ত মিঃ চ্যাটার্জি?

নিশ্চয়ই।

কি মনে হয় আপনার?

—এটা আগেই আমি আন্দাজ করেছিলাম যে, বিনয় পালিতের পরেই ডাঃ অমর বসু ধরা পড়বেন।

—কি, কারণ কি?

—কারণ অতি সহজ। এমন কি একথাও বলে দিতে পারি যে, এর পরেই বিপদে পড়বেন বিখ্যাত ধনী ধরমচাঁদ।

—কিন্তু একটা কথা স্যার—

—কি বলুন ত?

—মিলিওনেয়ার মিঃ বাসুর প্রতি হঠাৎ ড্রাগনের এত সহানুভূতি কেন জাগল বলুন ত?

—কারণ আছে মিঃ গুপ্ত।

—কি কারণ বলুন ত?

—মিলিওনেয়ার মিঃ বাসুকে লুণ্ঠন করে তারা প্রচুর অর্থের অধীশ্বর হয়েছে।

—তা ত বুঝলাম।

—ওই অর্থ দিয়েই আজ ওরা সারা বাংলাদেশে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। এমন কি বৈজ্ঞানিক নানা গবেষণা করে সারা বিশ্বজয়ের স্বপ্ন পর্যন্ত দেখছে তারা।

—তা হতে পারে।

—হতে পারে নয়—এটাই নিশ্চিতভাবে সত্য ঘটনা। ড্রাগন কখনো মিথ্যা কথার উপরে ভিত্তি করে কোন কাজ করে না।

—তা হলে, এখন কি করা যায়, তা বলুন?

—আমার ধারণা কি তা বলব?

—নিশ্চয়।

—আমার ধারণা এই যে, এখন ড্রাগনের পেছনে লেগে কোন লাভ নেই।

যদিও সে আইন অমান্যকারী একথা ঠিক—তবু বর্তমানে সে যে পথে চলেছে তা অন্যায় নয়। আমাদের এখন কর্তব্য হচ্ছে ওই তিনজন ধনীর দক্ষিণ হস্ত নবাব সিংকে জব্দ করা।

—তা কি সম্ভব?

—চেষ্টা করতে দোষ কি? তা না করতে পারলে সারা দেশের এই ঘোর অরাজকতা বন্ধ হবে না। তা ছাড়া ওরা ভয়াবহ কিছুও করে বসতে পারে।

—একথা ঠিক।

—এখন দেখা যাক, এদিকে কতটা সফল হতে পারি।

দীপক উঠে দাঁড়াল।

গভীর রাত।

ঢং ঢং করে দূরের পেটা ঘড়িতে দশটা বেজে গেল।

সারাটা কোলকাতা শহর ধীরে ধীরে জনহীন হয়ে পড়েছে। কেবল জনবহুল আছে শহরের এই বিশেষ অঞ্চলটা—অর্থাৎ চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রিট, ধর্মতলা প্রভৃতি অঞ্চল।

এই সময় ধীরপদে একজন লোক চলছিল পথ দিয়ে।

তার পরনে ভারী ওভারকোট, মাথার ফেল্ট, পায়ে দামী স্যু।

ধীরে ধীরে সে দাঁড়াল পার্ক স্ট্রিটের ইয়োলো হোটেলের সামনে।

কিছুক্ষণ পরে....

একজন লোক নামল ইয়োলো হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে। তাকে দেখে হঠাৎ ল্যাম্প-পোস্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা দীর্ঘদেহী লোকটির মুখটা খুশীতে ভরে উঠল।

ইয়োলো হোটেল।

লোকটি ট্যাক্সি থেকে নেমে হোটেলে প্রবেশ করল ধীর পায়ে।

কিন্তু সে জানতেও পারল না যে, একজন লোক ল্যাম্প-পোস্টের আড়াল থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল।

ইয়োলো হোটেলের সামনে এসে লোকটা কলিং বেল টিপল।

ক্রিং ক্রিং....

বেল বেজে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। ট্যাক্সি থেকে নামা লোকটা ভেতরে প্রবেশ করল।

ল্যাম্প-পোস্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি লক্ষ্য করল।

সে একটা ট্রান্সমিটার বের করল তার বড় ওভারকোটের পকেট থেকে। ট্রান্সমিটার সে ফিট করল পথের ধারে একটা জায়গায়—

—হ্যালো, হ্যালো....

অন্য দিক থেকে শব্দ ভেসে এলো—ইয়েস প্লীজ।

—কে?

—লালবাজার!

—থ্যাঙ্ক ইউ! চ্যাটার্জী স্পিকিং।

—কি খবর?

—কাম ইমিডিয়েটলি টু পার্ক স্ট্রিট, ইয়োলো হোটেল—

—ও. কে. স্যার।

– ভেরী আর্জেন্ট।

—ইয়েস স্যার।

লোকটা ট্রান্সমিটারটা বন্ধ করে পকেটে রাখল।

তারপর চুপচাপ প্রতীক্ষা করতে লাগল। তাকে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে দীপক চ্যাটার্জী ছাড়া সে অন্য কেউ নয়।

একটু পরে—

দূরে শব্দ হলো ভোঁ....ও....ও

পুলিশ ভ্যান-আসছে—একটা, দুটো, তিনটে ভ্যান।

দীপক এগিয়ে গেল। অনেকটা দূরে সে ভ্যানকে থামবার নির্দেশ দিল। ভ্যান থামল।

প্রথম ভ্যান থেকে নামলেন মিঃ গুপ্ত। তার পরের ভ্যানে আরও অনেক আর্মড পুলিশ।

মিঃ গুপ্ত বললেন—আপনার ফোন পেয়ে আমিও চলে এসেছি।

—খুব ভাল হয়েছে। আপনাকে পেলে আমার কাজের অনেক সুবিধাই হবে। কারণ আমি এই বিষয়ের সব খবর জানি।

—ঠিক আছে।

মিঃ গুপ্ত এগিয়ে চললেন দীপকের সঙ্গে।

তখনো হোটেলের সামনের দরজাটা খোলা ছিল। মিঃ গুপ্ত গিয়ে কলিং বেলটাতে পুশ করলেন।

একটু পরে—

দরজা খুলে গেল।

মিঃ গুপ্তের পরনে পুলিশী পোষাক ছিল না, ছিল প্লেন ড্রেস।

তিনি ও দীপক দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

সামনে ছিল একজন বেয়ারা।

মিঃ গুপ্ত প্রশ্ন করলেন—এটাই কি ইয়োলো হোটেল নাকি?

হ্যাঁ এটাই ইয়োলো হোটেল। কি প্রয়োজন বলুন?

—আমরা পুলিশের লোক। আমরা একটু হোটেলটা সার্চ করতে চাই।

—এক্ষুণি?

—হ্যাঁ, এক্ষুণি ম্যানেজারকে ডেকে দিন।

তৎক্ষণাৎ হোটেলের ম্যানেজার নেমে এলেন। তিনি দীপককে চিনতে পারলেন।

দীপক বললেন—আমাকে চিনতে পারছেন ত স্যার? আমি যাকে খুঁজছিলাম, তাকে একটু আগে এই হোটেলে ঢুকতে দেখেছি।

—একটু আগে?

—হ্যাঁ।

—একটু আগে ত ঢুকলেন তিনতলায় সেই বোর্ডার—যিনি ক'দিন এখানে আসেন নি।

দীপক বললে—তিনতলার ভাড়াটের ত টাকা বাকী ছিল।

—না, তা ছিল না। তিনি এখান থেকে চলে গেলেও সাত দিনের টাকা জমা দিয়ে গেছিলেন।

—ঠিক কথা। কিন্তু টাকা জমা দিয়ে এভাবে ডুব মারার কোনও অধিকার তার নেই।

—তা হতে পারে না। টাকা জমা দিয়ে গেলে অবশ্যই তাঁ সম্বন্ধে ব্যবস্থা রাখা কর্তব্য।

—তা না হয় হলো। কিন্তু তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই আমরা।

—কোথায়?

—এই হোটেলেই। এখানে যে সে থাকে তা আমরা জানি নিশ্চিন্তভাবে।

—ঠিক আছে। তাহলে আপনারা ভেতরে আসতে পারেন।

দীপক ও মিঃ গুপ্ত হোটেলে প্রবেশ করল। ভেতরে গিয়ে তারা হোটেলের তিনতলার দিকে এগিয়ে যায়।

তিনতলার ঘরটা বন্ধ।

দীপক ধাক্কা মারে। ভেতরে আলো তখনো জ্বলছিল, কিন্তু কোনও উত্তর ভেসে এলো না।

দীপক তখন জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগল—তবু দরজা খুলল না।

দীপক ও মিঃ গুপ্ত তখন প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে দরজাটা ভেঙে ফেলল। ভেতরে গিয়ে দেখতে পেলো, ঘর খালি—কেউ নেই ভেতরে।

মিঃ গুপ্ত বললেন—তা হলে পাখী আগেই বাসা ছেড়ে চলে গেছে?

—তাই ত দেখছি।

—তবে উপায়?

—উপায় কি তা কি জানেন না? আমি নিজের চোখে দেখছি তাকে ভেতরে ঢুকতে।

—নিজের চোখে দেখেছেন?

—সত্যি কথা।

—তা হলে নিশ্চয় কোনও গুপ্ত পথে সে এখান থেকে পালিয়ে গেছে।

—কোন্ পথে? পথ ত, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

দু'জনে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ নজর পড়ল পেছন দিকের জানলাতে একটি বড় দড়ি সংলগ্ন আছে।

দীপক এগিয়ে দেখল, দড়িটা নেমে গেছে রাস্তা পর্যন্ত।

দীপক বললে—এই দড়ি বেয়েই তা হলে সে পথে নেমে গেছে।

—এই দড়ি বেয়ে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তা হলে ত বেশি দূর যেতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয় না।

—না। হয়তো এখনো চেষ্টা করলে তাকে ধরতে পারা যাবে।

দ্রুত সকলে নীচে নেমে এলো।

—তা বটে।

—তা হলে তার পক্ষে অদৃশ্য হবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

—একথাও সত্যি। তবু দেখা যাক।

সকলে নেমে পড়ল পথে।

দীপকের মনে তখন নানা ধরনের চিন্তা খেলা করতে থাকে।

।। আট।।

নতুন তদন্ত পথে

পথে নেমে দীপক রতন আর মিঃ গুপ্ত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

তাদেরও মনে নতুন এক কৌতূহল।—এত কাছে পেয়েও নবাব সিংকে ধরা যাবে না কেন?

—কি করা যাবে বলুন? আগে থেকে আন্দাজ করে যদি সে পালিয়ে যায়, তাহলে কি করে তাকে আটকানো যাবে বলুন?

—তা ত বটেই।

—এখন ত হলে কি করা যায় বলুন ত?

—আমাদের এখন কর্তব্য হচ্ছে নবাব সিং-এর যারা প্রধান উৎসাহদাতা তাদের কথা চিন্তা করতে হবে।

—তারা কারা?

—তাদের দু'জন এখনো ড্রাগনের কাছে আছে—তা ত জানেন।

—তা অবশ্য শুনেছি।

—এখন পরবর্তী তৃতীয় ব্যক্তিটির প্রতি নজর দিতে হবে আপনাদের। সে কে তা জানেন ত?

—তা জানি।

—বলুন ত কে সে?

—সে হলো রাজা ধরমচাঁদ।

—ঠিক কথা। এখন রাজা ধরমচাঁদের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

—তাঁর ঠিকানা জানেন?

—জানব না কেন? রাজা ধরমচাঁদের ঠিকানা কে না জানে?

—ঠিক কথা। তিনি থাকেন তেইশ নম্বর পণ্ডিতিয়া রোড, বালিগঞ্জে।

—ঠিক আছে। এখন কি তাহলে সেখানে যেতে চান মিঃ চ্যাটার্জী।

—হ্যাঁ। তাঁর খবর একবার নেওয়া উচিত। প্রথম কথা ড্রাগনের নজর আছে তাঁর উপরে। তাছাড়া নবাব সিং পলাতক।

—ঠিক কথা। তাই অবিলম্বে আমাদের সেদিকে নজর দিতে হবে।

—বেশ, তবে চলুন।

পুলিশ ভ্যান ছুটল বালিগঞ্জের পণ্ডিতিয়া রোডের দিকে।

কিন্তু দীপকের যেতে বড় দেরী হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। কারণ তারা গিয়ে দেখতে পেল যে পণ্ডিতিয়া রোডের নির্দিষ্ট বাড়িটার দরজা হাঁ করে খোলা পড়ে আছে।

দীপকরা বিস্মিত হলো।

সারা বাড়ি অন্ধকার। দীপকরা বাধ্য হয়ে ভেতরে ঢুকল।

সামনের বারান্দায় টর্চ ফেলেই তারা দেখল, একজন লোক হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

দীপক ও মিঃ গুপ্ত তার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিল।

তারপর মাথায় জল ঢেলে লোকটার জ্ঞান ফেরানো হলো।

জ্ঞান ফিরে এলে লোকটা উঠে বসল। বললে—আমি কোথায়?

দীপক বললে—তুমি রাজা ধরমচাঁদের বাড়িতে আছ। এখন বলো ত কে তোমার এই দুর্দশা করল?

লোকটা বললে—তাদের চিনি না। দু'জনের মুখেই মুখোস পরানো ছিল।

—কি করে ঢুকল বাড়িতে?

—কলিং বেল টিপেছিল। আমি খুলতেই আমাকে আক্রমণ করে হাত পা বেঁধে ফেলে। তারপর একটা রুমাল শুকিয়ে আমাকে অজ্ঞান করে।

দীপকরা সকলে দোতলায় উঠে যায়।

রাজা ধরমচাঁদ বিপত্নীক। ছেলেমেয়ে কেউ নেই। তাই চাকরকে নিয়ে একাই থাকতেন দোতলায়।

দোতলায় উঠে দীপক দেখতে পেলো যে, সে-ঘরে ধরমচাঁদ নেই।

তাঁর বিছানা লণ্ডভণ্ড। একটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে।

দীপক বললে—কোথায় গেলেন তিনি?

মিঃ গুপ্ত বললেন—মনে হয় এই ঘর থেকে তাঁকে সরানো হয়েছে।

—তাই ত মনে হচ্ছে। ধস্তাধস্তিও কিছুটা হয়েছিল অবশ্যই।

—তা ত বোঝাই যাচ্ছে।

—কিন্তু তিনি উধাও হলেন কি করে? নিশ্চয়ই তাঁকেও অজ্ঞান করে সরানো হয়েছে এখান থেকে।

মিঃ গুপ্ত বললেন—এটাও কি ড্রাগনের দলের কাজ বলে মনে করেন আপনি?

—না।

—তবে?

—আগে ভাল করে ঘরটা দেখুন। তারপর বলছি।

ভাল করে ঘরটা সার্চ করা হলো। কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। শুধু পাওয়া গেল একটা চিঠি।

তাতে লেখা ছিল ঃ

মাননীয় দীপক চ্যাটার্জী ও মিঃ গুপ্ত!

আপনারা আমার পেছনে যে ফলো করতে পারেন তা আমি জানতাম। তাই সাবধানেই ছিলাম ও ঠিক সময়ে হোটেল থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছি।

তবে আমার দু'জন প্রধান অনুচর ড্রাগনের হাতে ধরা পড়েছে বলে রাজা ধরমচাঁদকে আমি জোর করে নিয়ে গেলাম।

রাজা ধরমচাঁদকে আপনারা পাবেন না, কারণ আমরা শিগ্‌গীরই এই পৃথিবী থেকে উধাও হচ্ছি।

অবশ্য মৃত্যুবরণ করছি না আমরা—আমরা মহাশূন্য ভ্রমণে যাচ্ছি সশরীরে। আমরা না চলে গেলে আমাদের সব সম্পদ যে অপহৃত হবে তা বলাই বাহুল্য।

আন্তরিকভাবে আপনাদের ব্যর্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। ইতি—

নবাব সিং

চিঠিটা পড়ে দীপক বললে—আজ সিং শেষ মুহূর্তে অদ্ভুত একটা চাল চেলেছে বটে।

—তার মানে?

—মানে তাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আর পাওয়া যাবে না। কবে যে ফিরবে

তাও অজ্ঞাত। কোথায় যাবে তাও জানি না।

মিঃ গুপ্ত বললেন—কিন্তু নবাব সিং-এর দল যে সত্যি মহাকাশযান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, তা কি আপনি বিশ্বাস করেন মিঃ চ্যাটার্জী?

—কেন করব না? এতে অসম্ভব ত কিছু নেই। মনে হয় তারা তাদের বিজ্ঞানীর সাফল্য সম্পর্কে জেনেই এতটা উদ্ধত হয়ে উঠেছে। তা না হলে ক্রাইম তারা করতে পারত না।

—তা হতে পারে। কিন্তু তাদের বর্তমান ঠিকানা অর্থাৎ কোথায় গেলে তাদের পাওয়া যাবে তা জানব কি করে?

—তা বটে। এটা জানা সত্যি খুব কষ্টকর। আর যদি ঠিকানা পাই সেটা মহাভাগ্য বলতে হবে।

কেউ আর কোনও জবাব দিল না।

।। নয়।।

বৈজ্ঞানিক সেনের মহাশূন্যযান

গভীর রাত।

দীপক ঘড়িতে দেখল যে, রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে।

দীপক বললে—এখন কোথায় যাওয়া যায় বলুন?

মিঃ গুপ্ত বললেন—চলুন, সবার আগে যাই লালবাজার।

—তা ত কাটে। কিছুটা বিশ্রাম করা উচিত এখন। কি বলেন?

—ঠিক কথা।

পুলিশ ভ্যান ছুটে চলল লালবাজারের দিকে।

লালবাজার পুলিশ ভ্যান থেকে নেমে দীপক ও রতন মিঃ গুপ্তের ঘরে বিশ্রাম করছিল।

দীপক বললে—ঘটনার গতি এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে যে, তা কল্পনা করা যায় না।

মিঃ গুপ্ত বললেন—তা বটে। তবে বৈজ্ঞানিক সেনের গোপন রিসার্চ কোথায় হচ্ছে সেটা জানা আমাদের বিশেষ দরকার।

—তা ত বটেই। কিন্তু এখন অনুশোচনা করে লাভ নেই। এটা ঠিক যে, বৈজ্ঞানিক সেন সরকারী অনুমোদন নিয়ে কাজ করছেন। তিনি কাজ করছেন গোপনে। তাতে প্রচুর অর্থ সাহায্য করছে এই দলটা।

—ঠিক কথা।

এমন সময়—

হঠাৎ ঘন ঘন ফোন বেজে উঠল।

দীপক ফোন তুলল।

—হ্যালো....কে কথা বলছেন?

—আগে বলুন আপনি কে?

—আমি দীপক চ্যাটার্জী কথা বলছি।

—ধন্যবাদ! আমি আপনাকেই চাই! বিশেষ জরুরী।

—কে আপনি?

—আমি দস্যু ড্রাগন।

—কি আপনার প্রয়োজন?

—শুনুন, রাজা ধরমচাঁদের বাড়ি থেকে আপনি এইমাত্র ফিরে এলেন তা আমি জানি। আমার নজর ছিল আপনাদের উপরে।

—তা বুঝলাম। কিন্তু এখন আপনি কি বলতে চান, বলুন।

—শুনুন আমার কথা। আমি বেশ ভাল করেই জানি নবাব সিং রাজা ধরমচাঁদকে নিয়ে কোথায় গেছে।

—কোথায়?

—সে গেছে বৈজ্ঞানিক সেনের সঙ্গে দেখা করতে ধরমচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে।

—তার উদ্দেশ্য?

—উদ্দেশ্য তারা পৃথিবী থেকে মহাকাশের পথে পাড়ি দেবে।

—কবে?

—মনে হয় আজ রাতেই।

—আজই?

—হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা।

—বৈজ্ঞানিক সেনের ঠিকানাটা কি তা জানেন? তাঁর রিসার্চের স্থান কোথায়?

—অশোকনগরের কাছে। অশোকনগর থেকে তিন মাইল পথ।

—সেখানে তিনি কি গবেষণাগার তৈরী করেছেন নাকি?

—ঠিক তাই। অশোকনগর থেকে তিন মাইল উত্তর-পূর্বে।

—ঠিক আছে। আমরা সেখানে এক্ষুণি যাত্রা করছি।

—দেখুন চেষ্টা করে। আমি তার আগেই চেষ্টা করব তাকে ধরতে। দেখা যাক্ না সফল হই কিনা।

ড্রাগন রিসিভার নামিয়ে রেখে দিল।

খুট্ করে শব্দ হলো একটা।

দীপক তাকাল মিঃ গুপ্তের দিকে।

বললে—সব শুনলেন ত?

—না, কিছু আন্দাজ করলাম। এ নিশ্চয় ড্রাগনের ফোন?

—ঠিক তাই। ড্রাগন মোটামুটি বৈজ্ঞানিক সেনের গবেষেণাগারের খবর দিয়েছে। এবার আমাদের কাজ কি বুঝলেন ত?

—কি কাজ?

—গেট আপ্ প্লীজ। চলুন, এবারে আমরা অশোকনগরের দিকে। সেখান থেকে যেতে হবে তিনমাইল দূরে।

—ড্রাগন কি সেখানে গেছে?

—হ্যাঁ, সে অনেক আগেই রওনা হয়ে গেছে মনে হয়। মধ্য-পথে কোনও এক জায়গা থেকে ফোন করেছিল।

মিঃ গুপ্ত বললেন—চলুন তবে—লেট আস স্টার্ট।

সকলে নীচে নেমে এলো।

মিঃ গুপ্ত আর এক ভ্যান পুলিশকে প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন।

সকলে তৈরী হলো।

পর পর তিনটি পুলিশ ভ্যান সগর্জনে ছুঠে চলল।

তাদের লক্ষ্য হলো অশোকনগর—বৈজ্ঞানিক সেনের গবেষণাগার।

।। দশ।।

মহাশূন্যে ড্রাগন

ড্রাগন যে নবাব সিংয়ের দলকে ফলো করে বৈজ্ঞানিক মিঃ সেনের ল্যাবরেটারী পর্যন্ত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারে তা মিঃ সেন বা নবাব সিং কেউ কল্পনা করতেও পারে নি।

ল্যাবরেটারীতে দুটো রকেটসহ মহাশূন্যযান ছিল। মিঃ সেন ও ক্রিমিন্যাল দলবল একটাতে উঠে বসল। মিঃ সেন নিজে রকেটটা চালু করে পাড়ি দিলেন মহাশূন্যের পথে।

ড্রাগন অনেক আগেই সেখানে পৌঁছেছিল। সে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ভাল করে দেখল কি করে মিঃ সেন রকেট চালু করলেন। ড্রাগন তখন ছুটে এসে অন্য মহাশূন্যযানটিতে উঠে তার রকেটটি চালু করল।

রকেট দু'টি সগর্জনে ছুঠে চলল কিছুটা আগে-পিছে।

দীপকরা এসে পৌঁছাল সেখানে আরও কিছুক্ষণ পরে। তারা দেখতে পেল আর কোনও রকেট নেই। দুটি রকেট মহাশূন্যযান ছুটে চলেছে মহাশূন্যের পথে।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে দীপক, মিঃ গুপ্ত প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

কিন্তু তাঁদের কিছুই করার নেই। তবু তাঁর হা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

মিঃ গুপ্তের সঙ্গে ছিল বাইনোকুলার। তিনি সেটির সাহায্যে দেখতে লাগলেন কি ঘটে চলেছে। মাঝে মাঝে দীপকও তার কাছ থেকে সেটা নিয়ে দেখতে লাগল আকাশের বুকে কি সব অদ্ভুত ঘটনা চলছে।

পৃথিবী থেকে অনেক দূর ওটার পরেই বোধহয় মিঃ সেন বুঝতে পারলে যে, আরও একটা রকেট তাঁদের রকেটকে ফলো করে ছুটে আসছে এই দিকে।

মিঃ সেন প্রমাদ গুণলেন।

মহাশূন্যে সাধারণ বন্দুক বা মেসিনগান ফায়ার করে লাভ হবে না। পৃথিবী থেকে যত দূরে তারা উঠছে, তত মহাকর্ষ-শক্তি কমে যাচ্ছে! তাই গুলি করলে তা দশ হাতও যাবে না। এটা ভাল করে জানত ওরা।

তবে দুটি মহাশূন্য যানেই ছিল এমন আগ্নেয়াস্ত্র যা ফায়ার করলে মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে অন্যদিকে আঘাত করতে পারে।

ড্রাগনের রকেট থেকে নিক্ষিপ্ত হতে লাগল এমনি অস্ত্র থেকে গোলাগুলি। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ সেন পাল্টা উত্তর দিলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর ড্রাগনের রকেটের অব্যর্থ লক্ষ্যে মিঃ সেনের মহাশূন্য যানটি হলে ক্ষতিগ্রস্ত।

মিঃ সেন উপযুক্ত মহাশূন্যের পোশাক পরে ঝাঁপ দিলেন শূন্যের ভেলায় চড়ে।

ড্রাগনও রকেট থেকে ঝাঁপ দিল।

মিঃ সেনের রকেটের অন্য সকলে ছিটকে পড়ল কোন অজ্ঞাত পথে তা কে জানে! ওরা নিশ্চয় মহাশূন্যের অজানা কক্ষপথে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

এদিকে ড্রাগনও নিজের শরীরকে রকেটের সঙ্গে সূক্ষ্ম অদৃশ্য দড়ি দিয়ে আটকে ঝাঁপ দিল মহাশূন্যে।

মুখোমুখি সংগ্রাম চলল মিঃ সেনের সঙ্গে ড্রাগনের।

অনেকক্ষণ চল মুখোমুখি যুদ্ধ। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রাণ হারালেন।

ড্রাগন তখন চলে এলো নিজের রকেটে। তারপর ফিরে চলল পৃথিবীর পথে। অবশেষে মহাসমুদ্রে তার রকেটটি পড়ল। তার আগেই ড্রাগন রকেট থেকে লাফ দিয়ে পড়ল সমুদ্রে।

ধীরে ধীরে সাঁতার দিয়ে ড্রাগন তীরে উঠল। তারপর চেয়ে দেখল যে, সে কোলকাতা থেকে অনেক দূরে মাদ্রাজের উপকূলে উঠেছে। ড্রাগন মনে মনে স্থির করল, আবার কোলকাতায় ফিরে সে নতুন অভিযান শুরু করবে।

পাতালপুরীতে ড্রাগন

।। এক ।।

বিপদের মাঝে

লোকটাকে দেখে বেশ চতুর আর চটপটে বলেই মনে হয়।

দুটি চোখের দৃষ্টি শিকারী কুকুরের মতই সন্ধানী আর উল্লাস।

পরনে সাধারণ একটা ফুলপ্যান্ট আর টেরিলিনের হাওয়াই শার্ট। পায়ে কাব্‌লি জুতা।

বেশ ভাল করে দেখে শুনে তারপর সে জংলা জায়গাটা পার হলো।

গাড়িটা টেনে নিয়ে দাঁড় করালো সেখানে।

আলোক স্তম্ভের আলোটা তেমন জোরালো নয়। পথে তাই আধো-আলো, আধো ছায়া যেন একটা রহস্যময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করছে।

শহরতলীর এই অংশে লোক চলাচল খুবই কম। তারপর আবার রাত হয়েছে।

আকাশে মেঘ করেছিল।

মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে চিক্‌মিক্ করে উঠছিল বিদ্যুৎ।

বাতাস বন্ধ। যে কোনও মুহূর্তে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামতে পারে।

লোকটা চিন্তিত হলো।

তাকে এখনও প্রায় আধ মাইল পার হতে হবে বাড়ি পৌঁছুতে গেলে। কিন্তু গাড়িটা বিপদ ঘটাল হঠাৎ—

লোকটা পকেটে হাত দিল। তার পিস্তলটা ঠিক আছে। কোনও ভয় নেই।

বার বার সে তার গাড়িটাকে মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছিল।

আজই এখন জায়গায় এভাবে গাড়িটা বিকল হয়ে তার বিপদ হয়েছে।

সে মনিবের নির্দেশে সব কাজই ঠিকমত করে যাচ্ছিল।

তবে আমেরিকান এম্‌ব্যাসী থেকে বেরিয়ে মনে হচ্ছিল কে বা কারা যেন তাকে অনুসরণ করছে।

এ সব ব্যাপারে সে বেশ সজাগ। তার মনিব তাকে ভালই ট্রেনিং দিয়েছে।

তাই পিছনের চকোলেট গাড়িটা যে তাকে অনুসরণ করছিল তা বুঝতে তার দেরী হয়নি।

এ-গলি ও গলি নানা পথ পেরিয়ে যখন গাড়িটা আবার ফিরে এসে বি-টি রোডে পড়ল, তখন আর পিছনে কোনও গাড়ি দেখতে পায়নি।

সে মনে মনে বললে—যাক্, বাঁচা গেল।

তারপর বাড়ির দিকে গাড়িটা ঘোরাতে গিয়ে চম্‌কে উঠল।

গাড়ি থেমে গেল আচম্‌কা। আর সেটা চলল না একটুও।

তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল সে।

বনেট খুলল।

মন দিয়ে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কোনও দোষ চোখে পড়ল না তার।

তারপর হঠাৎ খেয়াল হলো—

দু'তিনটে পার্টস গাড়ি থেকে কে যেন খুলে নিয়েছে।

সে যখন গাড়িটা রেখে এম্‌ব্যাসীর ভিতরে গেছিল সেই সময় কেউ এ কাজ করেছে।

এখন তার এ গাড়িটা নিয়ে বাড়ি ফেরবার চিন্তা করাও বাতুলতা।

সে ছোট্ট গাড়িটা অনেক কষ্টে ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেল কিছুটা।

কাছেই ছিল একটা কারখানা। সেখান থেকে দু'জন লোককে ডেকে এনে বাকী পথটুকু গ্যারেজে পৌঁছে দিল গাড়িটা।

গা ঘেমে গেছে।

কপাল থেকে ঘাম ঝরচে অবিরাম। অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে তার।

গ্যারেজে গাড়িটা তুলে দিয়ে সে একটা শর্টকাট পথ ধরল বাড়ি যাবার জন্যে।

মনে মনে চিন্তা করতে করতে চলল বাবুকে সব কথা রিপোর্ট করতে হবে। তাই মিঃ জেমসের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছিল সব চিন্তা করতে করতে পথ চলল সে।

হঠাৎ—

ঝোপটা পার হবার সময় নির্জন গলিপথে ঘটে গেল একটা ঘটনা।

ঝোপের মধ্যে যে দু'জন লোক বসে ছিল তা সে কল্পনা করতেও পারেনি।

দু'জনে আচমকা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তার উপরে, দু'জনের হাতেই ছিল লোহার ডাণ্ডা।

আচম্‌কা আঘাত পড়ল তার মাথায়।

লোকটা একেবারেই অপ্রস্তুত ছিল। তাই সে আঘাত পেয়েই পড়ে গেল।

কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরে ঝোপের পাশের মাটিকে সিক্ত করে তুলল এক মুহূর্তে।

লোকটা কোন শব্দ করতে পারল না। পড়ে গেল মাটিতে। জ্ঞান হারাল।

এক মিনিট।

আরও দু'জন লোক নিঃশব্দে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো।

—শেষ নাকি?

—তাই তো মনে হয়।

টর্চের আলো পড়ল তার উপরে চারজনে জড়ো হয়েছিল।

দেখল, মাথার হাড় ফেটে হাঁ হয়ে গেছে—মাথার ঘিলু বেরিয়ে এসেছে।

—আর পড়েছে কিছু রক্ত।

—ঠিক আছে। শেষ—

—এখন কি করব?

—ওকে তুলে নাও।

চারজনে তাকে ধরাধরি করে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল।

জঙ্গলের মধ্যে বিরাট গর্ত খোঁড়াই ছিল।

লোকটির পোষাক সব খুলে নিল ওরা।

মুখখানা ছুরি দিয়ে এমন ভাবে ক্ষতবিক্ষত করল, যে, দেখলে আর তাকে চেনাই যাবে না।

তারপর গর্তের মধ্যে তাকে নামিয়ে শুইয়ে দেওয়া হলো।

তারপর মাটি চাপা দিয়ে জায়গাটা সমান করে দিল ওরা।

একজন বলল—সব শেষ?

—না, আরও একটু কাজ বাকী।

—কি?

সে পকেট থেকে একমুঠো ঘাসের বীজ বের করে মাটির উপরে ছড়িয়ে দিল। বললে—তিনদিনে ঘাস গজিয়ে যাবে, না কিছু।

—ঠিক কথা।

—এবার চল। পরবর্তী কাজ করতে হবে এখন।

—হ্যাঁ, চল।

মৃত লোকটির পোষাক খুলে নিয়ে ওরা সকলে মিলে ঢুকল একটা সাদা একতলা বাড়ির মধ্যে।

।। দুই ।।

লালবাজারে টেলিফোন

শীতেরে শেষ। বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে বাতাসে। গরম খুব না পড়লেও শীত কমে এসেছে।

সেদিন সকালবেলা।

দীপক চ্যাটার্জি সকালে খবরের কাগজ পড়ছিল ও জলযোগ করছিল।

জলযোগের আয়োজন আজ একটু বেশিই ছিল।

ফুলকপির সিঙাড়া, কড়াইশুঁটির কচুরি, টম্যাটোর চাটনি আর মাংসের চপ।

খাবারের দিকে তাকিয়ে দীপক তার চাকর ভজুয়াকে বললে—আজ আয়োজনটা একটু বেশিই মনে হচ্ছে যে?

ভজুয়া হাসল।

এটা তার চিরদিনের স্বভাব, কোনদিন যে কি খাবার পরিবেশন করবে সে তা আগে জানায় না।

হঠাৎ খাবারগুলো এনেই স্টান্ট দিতে সে ভালবাসে।

তা ছাড়া কবে যে কোন বাজারটা সে করল তাও জানতে দেয় না।

দীপকের কথা শুনে ভজুয়া বললে—বাবু, এসব ত শিগগিরই বন্ধ হয়ে—যাবে—বড় জোর আর দিন পনেরো এসব পাওয়া যাবে। তাই গরম পড়ার আগে ভালভাবে খেয়ে নিন।

—ঠিক আছে।

দীপক খেতে খেতে খবরের কাগজের পাতা উল্টে চলেছিল—এমন সময় হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল ঝন্ ঝন্ করে।

রিসিভার তুলল দীপক।

—হ্যালো....কে?

—দীপকবাবু ত?

—হ্যাঁ।

—আমি মিঃ সেন। লালবাজার থেকে কথা বলছি।

—বলুন।

—একটা বিশেষ গোপনীয় ও জরুরী কেসে আপনার সাহায্য চাই স্যার।

—গোপনীয়?

—হ্যাঁ। একান্তভাবে। তাই ফোনে বলতে পারলাম না সেটা।

—ঠিক আছে।

—আপনাকে এক্ষুণি একবার আসতে হবে লালবাজার হেড কোয়ার্টার্সে। পুলিশ কমিশনার সাহেবও সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

—ঠিক আছে। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাচ্ছি স্যার।

—অলরাইট!

ফোনটা নামিয়ে রাখল দীপক। তারপর বললে ভজুয়াকে—এত খাবার খেয়েই সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিতে হবে যে ভজুয়া—কষ্ট হবে খুব, তবুও উপায় কি।

—কেন বাবু?

—ডাক এসেছে।

—আবার কি কোনও খুনখারাপি?

—না, তা ঠিক নয়। তবে খুব গোপনীয় ব্যাপার শুনলাম।

দীপক দ্রুত দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা সেরে নেবার কাজে মন দিল।

লালবাজারে পৌঁছেই সটান পুলিশ কমিশনার রাজীব মুখার্জির ঘরে গেল দীপক।

তিনি দীপককে দেখে খুশী হলেন।

—এই যে আসুন মিঃ চ্যাটার্জি। বসুন। আর এঁকে ত চেনেন?

—হ্যাঁ, মিলিটারীর ক্যাপটেন ঘোষ।

ক্যাপটেন ঘোষ শেক্‌হ্যাণ্ড করলেন।

—আর এঁকে চেনেন না? ইনি হলেন মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের কর্ণেল অজিত বিশ্বাস।

কর্ণেল বিশ্বাস দীপকের দিকে তাকালেন।

পরিষ্কার কামানো দাড়ি, লম্বায় ছ'ফুট। পরনে কিন্তু সাধারণ টেরিলিনের শার্ট আর প্যান্ট।

সুদৃঢ় চোয়াল।

মুখে অটল গাম্ভীর্য যেন তাঁর।

দু'টি চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বোঝা যায় যে তিনি কড়া ধাতের মানুষ।

তিনি করমর্দনের জন্যে হাত বাড়ালেন। দীপক দেখল শক্ত চওড়া পাঞ্জা তাঁর। ক্যাপটেন ঘোষের সঙ্গে আগে দু'একটা কেসে দীপকের পরিচয় হয়েছিল।

কিন্তু কর্ণেল বিশ্বাসের সঙ্গে আজই হলো প্রথম পরিচয়।

এঁদের দেখেই দীপক বুঝতে পারল যে, কেসটা পুরো মিলিটারী বিভাগের।

আর খুব গোপনীয় কেস সন্দেহ নেই। তা না হলে এঁরা আসতেন না।

দীপক বললে—কেসটার ইতিহাস কি এখন বলবেন স্যার?

—হ্যাঁ। বলে মিঃ মুখার্জি তাকালেন কর্ণেলের দিকে।

কর্ণেল বললেন—আমি বলব?

—হ্যাঁ।

—বেশ।

তিনি চেয়ারে নড়ে-চড়ে বসলেন। নিজেকে তিনি তৈরি করে নিলেন বলবার জন্যে।

।। তিন ।।

ঘনীভূত রহস্য

কর্ণেল বিশ্বাস বললেন—আপনারা দু'জনেই পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আর ক্যাপটেন ঘোষও উচ্চ মিলিটারী অফিসার। তাই আপনাদের সামনে সব

কথা বলতে বাধা নেই। কি বলুন?

—নিশ্চয়।

—তা হলে আগাগোড়া শুনুন।

বলে তিনি একটু থেমে বললেন, আমরা যে কাজ করি তা শুধু গোপনীয় নয়—একান্ত গোপনীয়। কথা একটা ফাঁস হলে আমাদের জীবন নিয়ে টানাটানি হয়।

—তা বটে।

একটু থেমে কর্ণেল বললেন—আমার আসল নাম বলব না। আমাকে কর্ণেল বিশ্বাস বলেই জানবেন। ভারত সরকারের সামরিক গুপ্তচর বিভাগের গোপন রেকর্ড বিভাগের আমি কর্ণেল। কর্ণেল বিশ্বাস এই নামই জেনে রাখুন। আর আমার পরিচয় যে ঠিক তা দেখবার জন্যে আমি পরিচয়পত্র আগেই পেশ করেছি।

মিঃ মুখার্জি বললেন—আপনার পরিচয় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না।

—তা ঠিক। আপনারা হয়ত ভাবছেন, আমি মিলিটারীর লোক—আমার গায়ে প্লেন স্যুট কেন? তারও কারণ আছে। দেশবিদেশ আমি ও পরিচয়ে পরিচিত নই। আমি একজন ব্যবসায়ী মাত্র। বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানির আমি একজন ডিরেক্টর বা মালিক। পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে বেড়াই এই ব্যবসায়ের সূত্র ধরে। নানা খবর আমরা যোগাড় করে তা ভারত সরকারকে পাঠাই। পাকিস্তান যে জার্মানী থেকে গোপনে মিসাইল সংগ্রহ করেছিল সে খবরও আমরা প্রথম পাঠাই। তবে বিপদ আমাদের প্রতি মুহূর্তে। আমরা ধরা পড়লে নিস্তার নেই।

—কেন?

—কোনও সরকারই গুপ্তচরের বিশ্বাস করে না। ফলে হয় প্রাণদণ্ড। আর তা থেকে বাঁচার কোন উপায় থাকে না। যাক্ সে কথা। এখন যে ব্যাপারে এসেছি তাই আগে বলি।

চেয়ারটা আরও কাছে টেনে নিয়ে অতি মৃদুস্বরে বলতে লাগলেন কর্ণেল বিশ্বাস।

—বহুদিনের চেষ্টায় কাল একটা অতি গোপনীয় গুপ্ত তথ্যের খসড়া আমি যোগাড় করি। তার নক্সা আমি হাত করি।

—কি সেটা?

—সেটা একটা অস্ত্রের নক্সা।

—অস্ত্রের নক্সা?

—হ্যাঁ। চীন গোপনে এমন একটা অস্ত্র তৈরী করছে যা বের হলে তার কাছে আণবিক বোমাও 'শিশু' বলে মনে হবে।

—সেকি!

—হ্যাঁ।

—চীন সেটা তৈরী করেছে?

—না, করছে—এখনো তা শেষ হয়নি। শেষ হলে চীন তা পরীক্ষা করবে ভিয়েৎনাম রণাঙ্গনে।

—কী ভয়াবহ ব্যাপার!

—ঠিক তাই। এ থেকেই বুঝতে পারবেন যে, সেই নক্সাটি কত গুরুত্বপূর্ণ।

—তা বটে।

—আজ সকালে সেটা নিয়ে আমার দিল্লী যাবার কথা। সকালে বের হবার সময়েও তা ছিল আমার কম্বিনেশন স্টীল সেফ্-এ। কিন্তু দিল্লীর টিকিট কিনে ফিরে এসে দেখি, সেটা আমার সেফ্ থেকে উধাও হয়েছে।

—উধাও?

—হ্যাঁ।

—কিভাবে?

—কিভাবে তা আমিও বুঝতে পারছি না। তালাটা বন্ধ আছে। সব ঠিক আছে। অথচ নক্সাটা যথাস্থানে নেই। তাই আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল এটা দেখে। যদিও জানি, সেটা ওখানেই ছিল, তবু গোটা সেফ ও বাড়িঘর সব খুঁজে দেখলাম। কিন্তু সেটা পেলাম না। এখন প্রশ্ন নক্সাটা সরালো কে এবং কি করে তা সরালো?

দীপক বললে—তারপর?

—তারপর স্থানীয় থানায় ফোন করে এই খবরটা জানালাম। আর ছুটলাম ইস্টার্ন কম্যান্ডের এই ক্যাপটেন ঘোষের কাছে। ইনিই আমাকে নিয়ে এলেন এখানে। যদি এই নক্সা চুরির রহস্যভেদ করতে পারেন দীপকবাবু, তাহলে এটা হবে আপনার একটা প্রধান কীর্তি।

—তা বটে।

একটু থেমে দীপক বললে—কিন্তু নক্সাটা চুরি করে চোরের কি লাভ হবে কর্ণেল বিশ্বাস?

—সাধারণ চোরের লাভ নেই ঠিক। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—এ চোর যদি বৈজ্ঞানিক গুপ্তচর বিভাগের লোক হয়, তবে তার অনেক লাভ।

—কি রকম?

—এক হিসাবে আমিও ত একটা চোর। তাই নয় কি? এই নক্সাটি পেতে বিপুল টাকা আমাকেও ত খরচ করতে হয়েছে।

—বিপুল টাকা!

—তা শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন।

— কি রকম?

—মোট এক লাখ দশ হাজার টাকা আমার খরচ হয়েছে।

—এত টাকা?

—হ্যাঁ। এর চেয়েও অনেক বেশি টাকা খরচ করতে হয় আমাদের। সে হিসেবে এতদামী জিনিসের জন্যে এটা বেশি নয়। এই নক্সাটা কিন্তু রণক্ষেত্রের চেহারা পাল্টে দিতে পারে।

—তা বটে।

—তবে যে লোক এটা দিয়েছে, সে এতটা জানত না। তাই অনেক কম টাকায় আমি এটা পেয়ে গেছি বলতে পারি।

—সেই লোকটি কে কর্ণেল বিশ্বাস?

—তা বলতে পারব না?

—কেন?

—তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। আর তা আমারও ক্ষতি করবে।

—তাই বুঝি?

—তবে তার ডাকনাম হলো মিঃ ম্যাচ্।

—আশ্চর্য নাম ত!

—হ্যাঁ। আমাদের লাইনে এমনি সব কোড্ নাম থাকে অনেক।

—আচ্ছা, এই ম্যাচ্ ত আবার এটা চুরি করে নিতে পারে?

—না। সে খুব বিশ্বাসী। তা ছাড়া নক্সাটা দিয়ে সে কালই চলে গেছে নরওয়েতে।

—আই সী।

কর্ণেল বিশ্বাস বললেন—তা হলে বুঝে দেখুন যে, এটা যে চুরি করেছে সে কত করিৎকর্মা লোক।

—তা ত বটেই। দীপক বললে, আচ্ছা, একটা কথা—

—বলুন।

—ঘটনাস্থলে তদন্ত করতে যেতে হবে আমাকে?

—নিশ্চয়।

—মিঃ মুখার্জিও ত সঙ্গে যাবেন?

—না, আমি যাব না। বললেন মিঃ মুখার্জি।

দীপক বললে—আর একটা কথা কর্ণেল, স্থানীয় লোকেরা সন্দেহ করবে না ত?

—না, আমি আজ সকালেই পাড়ায় বলেছি যে আমার একটা রিস্টওয়াচ চুরি গেছে। তার দাম প্রায় হাজার টাকা।

—বুঝেছি।

—তাই পুলিশ সেখানে গেলে কেউই সন্দেহ করতে পারবেন না।

—কাজটা ভালই করেছেন।

মিঃ মুখার্জি বললেন—উইশ্ ইউ সাকসেস মিঃ চ্যাটার্জি।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!

ওরা উঠলেন সেখান থেকে।

তারপর গাড়িতে উঠে তাঁরা চললেন কর্ণেল বিশ্বাসের বাড়ির দিকে।

।। চার ।।

তদন্তপথে দীপক

গাড়িটা একটু নিরিবিলি রাস্তায় এসে দীপক বললে—আচ্ছা কর্ণেল, আর সকালে ক'টার সময় শেষবারের মত আপনি নক্সাটা দেখেন?

—আটটা দশ-এ।

—ক'টায় বাড়ি থেকে বের হন?

—ন'টায়।

—এই পঞ্চাশ মিনিটে কি কি করলেন?

—স্টীল সেফ লক করলাম। তারপর পোষাক পাল্টালাম, দাড়ি কামালাম, ঘরে তালা দিলাম, সিঁড়ির নিচের দরজায় তালা দিলাম, দারোয়ান বাহাদুরকে সতর্ক করে তারপর ট্যাক্সি ডেকে রওনা হলাম।

—ফিরলেন ক'টায়?

—পৌনে এগারোটায়।

—এসে বাইরে থেকে ফিরে এসে সেফ খোলা আমার অভ্যাস।

—ভাল অভ্যাস। তাই চুরিটা চটপট ধরা পড়ল।

—তাই মনে হচ্ছে বটে।

—ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে সিঁড়ির দরজার তালা যা শোবার ঘরের তালা খোলা কি সম্ভব?

—সম্পূর্ণ অসম্ভব? প্রত্যেকটি তালা পুরোপুরিভাবে বার্গলার প্রুফ। ভিতর থেকে প্রতিটি দরজা বন্ধ করি। তা ছাড়া দিনের বেলা বা রাতে দেয়াল বেয়েও ওঠা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

—কেন?

—কারণ, একদিকে আছে বীর বাহাদুরের কড়া পাহারা। তাছাড়া কুকুর টেরার। তাকে ফাঁকি দিয়ে ওপরে ওঠা অসম্ভব।

—টেরার কী শ্রেণীর কুকুর?

—অ্যালসেসিয়ান।

—নক্সাটা হাতে আসার পর কি বাইরের কোনও লোক আপনার কাছে এসেছিল?

—না।

দীপক ভাবতে থাকে। সব দিকেই বাধা, এগোবার পথ খুঁজে পায় না।

ক্যাপটেন ঘোষ সব কথা শুনছিলেন।

এবার তিনি বললেন—জটিল রহস্য, তাই না দীপকবাবু?

—তা বাবু।

—একটা কথা আছে—

—বলুন।

—কর্ণেলের ধারণা নক্সাটা ওঁর বাড়ির বাইরে যেতে পারেনি।

—তার মানে বাড়ির লোক কেউ সরিয়েছে ওটা?

—মানে তাই বটে।

—এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা।

—তা বলতে পারেন।

কর্ণেল বললেন—সত্যি এটা যেন একটা বিরাট ধাঁধা মিঃ চ্যাটার্জি।

—ধাঁধা?

—নয়ত কি! প্রতিটি লোক পরম বিশ্বাসী। তারা দীর্ঘদিন কাজ করছে। অথচ এভাবে চুরি হলো নক্সাটা? তাছাড়া এটা টপ মিলিটারী সিক্রেট শত্রুপক্ষ এটা পেলে ভারতের সর্বনাশ হবে।

—নক্সা বাড়িতেই আছে, একথা ভাবছেন কেন?

—কারণ, বীরবাহাদুর টেরারকে পেরিয়ে কেউ বাইরে যেতে পারেনি। সকলে বাড়িতে ছিল। আমি মাত্র দু'ঘণ্টা বাইরে ছিলাম। ফিরে এসেই সবাইকে একটা ঘরে আটকে রেখেছি।

—তা ভালই করেছেন।

—আর এ ত কারেন্স নোট নয় যে ইচ্ছা করলেই তা ভাঙানো যাবে?

—তা বটে।

—এটা বিক্রি করতে হলে দু তিনটি দূতাবাসে গিয়ে তা দেখাতে হবে। দাম যাচাই করতে হবে। এ সবের জন্যেও ত সময় চাই।

—তা ত নিশ্চয়ই।

—তা করতে গেলে ভারতীয় গুপ্তচররা ধরে ফেলবে সহজেই।

—হুঁ।

—তা ছাড়া একদল গুণ্ডা লেলিয়ে দিতে পারে তার বিরুদ্ধে বিনা টাকায় এটা হাত করার জন্যে। এরকমও হয়।

—তাহলে জটিলতা আরও বাড়ল?

—তা ঠিক। তবে এটা অনেকটা নিশ্চিন্ত যে, এটা বাড়ি থেকে এখনও বাইরে যায়নি।

—তা হতে পারে। দেখা যাক।

দীপক চিন্তিত হলো।

কর্ণেল বিশ্বাস বললেন—যাক্, আমার বাড়ি এসে গেছে। ঐ যে—

—আচ্ছা, আপনি শহরতলীতে থাকেন কেন কর্ণেল?

—এটা অনেকটা নিরাপত্তার জন্য।

দীপক আর কথা বাড়াল না।

।। পাঁচ ।।

কর্ণেলের বাগানবাড়ি

শহরতলী।

কোলকাতা থেকে বেশ একটু দূরে কর্ণেলের বাগানবাড়িটা দণ্ডায়মান।

মস্ত কমপাউণ্ড, আম গাছ, জাম গাছ, আমলকী বন, ফুলের ঝাড়।

দীপক বললে—সুন্দর পরিবেশ।

—তা বটে।

সামনে বিরাট কোলাপসিবল্ গেট। ওঁরা গেলে দারোয়ান গেট খুলে দিল।

সামনেই ছিলেন স্থানীয় থানার ও.সি.। তিনি এগিয়ে এলেন।

—দীপকবাবু যে!

—হ্যাঁ।

—যাক্, অনেকটা ভরসা পেলাম। তাহলে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে কেস।

—আমি মহামানব নই।

—তা ত বটেই। বলে তিনি হাসলেন।

দীপক গেল বাড়ির পেছন দিকে। চারদিকে সুউচ্চ দেওয়াল। রেন ওয়াটার পাইপগুলো দেয়ালে রাখা।

দেওয়াল সোজা উঠে গেছে। সে দেওয়াল বেয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব।

আশেপাশে লোকজন বিশেষ নেই।

ভেতরে ঢুকল দীপক ও ক্যাপ্টেন ঘোষ।

তারপর কর্ণেলের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে লন পেরিয়ে আর একটা গেটের কাছে দাঁড়াল।

সে গেটেও তালা লাগান।

তালা খুলে কর্ণেল বললেন, চলুন ভেতরে যাই আমরা।

—হ্যাঁ, চলুন।

ভেতরে গিয়ে দীপক ভাল করে তাকাল। তালাবন্ধ গেটের তালা না ভাঙলে জনপ্রাণীও ভেতরে যাবার উপায় নেই।

দীপক বললে—আচ্ছা কর্ণেল—

—আজ্ঞে! বললেন কর্ণেল।

—আপনার আসল পরিচয় কি?

—আমার আসল পরিচয় কেউই জানে না, একমাত্র দারোয়ান বীর বাহাদুর আর ড্রাইভার রমানাথ ছাড়া, তারা জানে আমি মিঃ দাস।

—তাই নাকি? ঠিক আছে।

—দীপক সাবধান হলো।

তারপর বললে—চাকর-বাকর কে কে আছে?

—দারোয়ান বীর বাহাদুর, ড্রাইভার রমানাথ, বাগানের মালী ভরত সিং ও তার ভাই, আর পাচক যদুনাথ—জাতে উড়িয়া।

দীপক হাসল।

হাসলেন যে?

—দেখছি, বাঙালী, নেপালী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া সব রকম লোকই রেখেছেন।

—তা ঠিক।

—কিন্তু এত জাতের লোক কেন?

—বিভিন্ন জাতের লোক থাকলে তারা কোনও চক্রান্ত করতে পারবে না সহজে।

—তা ঠিক।

বীর বাহাদুরকে ডাকলেন কর্ণেল।

বললেন—সকলে কামরায় আটক আছে ত বীর বাহাদুর?

—জী হাঁ।

—হাম্ জব নহী থা, কোই আদমী আয়া?

—নহি হুজুর। ইধার পাহারামে হাম্ হ্যায়, উধার পোলিশ হ্যায়।

—ঠিক হ্যায়।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন সকলে।

দোতলায় তিনটে ঘর। প্রথমটা হলো কর্ণেলের ড্রইংরুম বা বৈঠকখানা।

তারপাশে দুটি ঘর। শোবার ঘর আর গোপন একটি কক্ষ।

একপাশে বারান্দা।

প্রতিটি ঘরে ভারী তালা।

সে তালা খোলা সাধারণ কোন চোরের পক্ষেই সম্ভব নয়।

দীপক চিন্তা করতে লাগল।

।। ছয় ।।

প্রাথমিক তদন্ত

বারান্দা থেকে নিচের দিকে তাকাল দীপক।

নিচে থেকে বারান্দায় উঠে আসার মত কোনও অবলম্বন দেখতে পেল না সে।

শোবার ঘরের তালা খুললেন কর্ণেল বিশ্বাস।

বললেন—আসুন মিঃ চ্যাটার্জি, আসুন ক্যাপ্টেন ঘোষ—এটা আমার শোবার ঘর।

বাগানের দিকের দুটি জানালা খুলে দিলেন তিনি। আধো অন্ধকার ঘরটা সঙ্গে সঙ্গে আলোয় ঝলমল করে উঠল যেন।

ঘরের মাঝখানে সিংগল বেড ইংলিশ খাট, জানালার কাছে লেখার টেবিল ও খান তিনেক চেয়ার, একটা আলনা, একটা বেঞ্চি— তার উপরে তিনটে সুটকেশ।

এসব দেখতে দীপকের কয়েক সেকেন্ড মাত্র লাগল। তার চোখ আটকে গেল ঘরের অন্য কোণে থাকা অ্যাশ কালারের একটা আলমারির ওপরে।

দু'হাত চওড়া ও চার হাত লম্বা আলমারিটা। একটা মাত্র পুরু ও বিশেষ ধরনের ইস্পাত দিয়ে সেটা তৈরী। কোথাও কোন জোড়া নেই।

আলমারির পেছন দিকে লোহার আংটা—তাতে লোহার শিকল পরানো। তা দু'দিককার দেওয়ালে গাঁথা।

সামনের পাল্লা দুটিও নিখুঁতভাবে এঁটে আছে—তাতেও জোড়ার চিহ্ন নেই।

অবাক হয়ে দীপক সেই বিরাট সুদৃঢ় স্টিলের আলমারিটা দেখল।

ক্যাপ্টেন ঘোষও মন দিয়ে সেটা দেখছিলেন। অনুমোদনের ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে বললেন—সত্যি এটা অদ্ভুত মজবুত।

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কর্ণেলের মুখ। তিনি বললেন—বিখ্যাত একটা জার্মান ফার্ম এটা তৈরী করে দিয়েছে।

দীপক বললে—এর জন্যে মোটা 'ফরেন মানি'ও খরচ হয়েছে নিশ্চয়?

—তা বটে। সবসুদ্ধ দাম নিয়েছে প্রায় আটান্ন হাজার টাকা।

—বলেন কি? ক্যাপ্টেন ঘোষ তা প্রায় হতভম্ব।

তা দেখে কর্ণেল বললেন—এর চেয়েও দামী সেফ আমি জীবনে দেখেছি অনেক। তার দাম ষাট-সত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত।

—তা হবে। তবে সেটি কোথায় দেখেছেন কর্ণেল?

—আমাদের ওপরওয়ালা যে সব অফিসার আছেন তাঁদের বাড়িতে। যা হোক ইলেক্‌ট্রনিক কম্বিনেশন সেফের এটাই হচ্ছে আধুনিকতম মডেল। এই যে ডালাতে 'এ' থেকে 'সি' পর্যন্ত সব অক্ষর সাজানো আছে, এ দ্বারা অনেক কথাই সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু আসল কথাটা তৈরী না করলে এ খুলবে না কিছুতেই।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দীপক বললে এই কম্বিনেশন কথাটা আর কেউ জানে?

—সেই ফরেন কোম্পানীর চীফ মেকানিক যারা এটা তৈরী করে ছিল তারা ছাড়া আর কেউ জানে না।

—আচ্ছা আপনার হাউস স্টাফের কেউ জানে?

—না।

—আচ্ছা সেফের ভেতরটা একবার কি দেখতে পারি আমি?

—নিশ্চয়। কিন্তু তার আগে আপনাদের পাশের ঘরে যেতে হবে।

—কেন?

—আপনাদের সামনে ত খুলতে পারি না। এটা একান্ত গোপনীয়।

—ঠিক আছে। ওঘরে কি আছে?

—ওটা আমার লাইব্রেরী। ওখানে আছে চারটে আলমারি ভর্তি বই, চেয়ার, টেবিল, ফোন ইত্যাদি।

—ঠিক আছে।

পাশের ঘরে গেল ওরা।

মাঝারি আকারের ঘর। চারটে চেয়ার, একটি টেবিল আর চারটে আলমারিতে বই প্রায় ভর্তি।

দুটি ঘরের মাঝে একটি দরজা ছাড়া অন্য কোনও দরজা নেই ওঘরে যাবার। বাগানের দিকেও দুটি দরজা। তা খুলে দিল দীপক!

আলোয় ঘরটা ভরে গেল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাল দীপক।

এ ঘরের পর্যবেক্ষণ শেষ হতে না হতেই কর্ণেল এসে ডাকলেন—আসুন আপনারা।

খোলা সেফের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

ভেতরে অনেকগুলো ইস্পাতের ড্রয়ার।

তার কোনটার সামনে লেখা 'আর্জেন্ট', কোনটায় লেখা 'কনফ্রিডেনসিয়্যাল', 'সিক্রেট' ইত্যাদি।

একটাতে লেখা 'টপ সিক্রেট'। তার ঠিক পাশের ড্রয়ারে লেখা 'টপ মোস্ট সিক্রেট'।

সেটা টেনে খুলে ফেললেন কর্ণেল। বললেন এর মধ্যেই ছিল সেই বিশেষ গোপনীয় তথ্যপূর্ণ নক্সাটি।

দীপক ড্রয়ারটা দেখল।

ফাঁকা, কিছুই নেই তাতে।

দীপকের মুখের মাংসপেশীগুলি যেন দৃঢ়তায় টানে টান হয়ে উঠল।

সে বললে—আপনি একটু সরে দাঁড়ান ত কর্ণেল বিশ্বাস।

বলে সে পকেট থেকে শক্তিশালী ম্যাগ্‌নিফাইং লেন্স বের করে ড্রয়ার পরীক্ষা করতে লাগল। পরীক্ষা শেষ হলে হতাশভাবে ঘাড় নাড়ল।

—কি হলো দীপকবাবু? প্রশ্ন করলেন কর্ণেল বিশ্বাস।

—প্রথমবার আমাদের পরাজয় হলো।

—তার মানে?

—মানে, অপরাধীর আঙুলের ছাপ যদিও বা থাকে, কিন্তু তা নেই।

—কেন?

কারণ হলো আপনার স্থূল হস্তের অবলেপন। ড্রয়ারে বর্তমানে আপনার আঙুলের অসংখ্য ছাপ ছাড়া আর অন্য কোনও ছাপ নেই।

ক্যাপ্টেন ঘোষ বললেন—আপনি কি ড্রয়ারটা অনেকবার খুলেছিলেন।

—হ্যাঁ। কারণ নক্সাটা হারিয়ে আমি ত প্রায় পাগলের মত হয়ে গেছিলাম।

—আচ্ছা একটা কথা—

—বলুন?

—অন্য কোন ড্রয়ারে ত সেটা রাখেননি ভুল করে?

—না। তবুও আমি সব ড্রয়ার খুঁজেছি। সেটা কোথাও নেই। তখন আঙুলের ছাপের কথা আমার মনেই আসেনি।

—বুঝেছি।

দীপক কি যেন চিন্তা করছিল।

তারপর বললে—যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। আপনি সেফ বন্ধ করুন কর্ণেল। আমি এবার অন্য পথে তদন্ত চালাব।

—কোন পথে?

—দেখি সেটা।

দীপক আর ক্যাপ্টেন ঘোষ আবার ফিরে গেলেন পাশের ঘরে।

।। সাত ।।

তদন্তের সূত্র

কর্ণেল বিশ্বাস আলমারিটা বন্ধ করলেন।

তিনি ফিরে এলে দীপক বললে—এই কম্বিনেশনে সেফের 'কম্বিনেশন' শব্দটি আপনি ছাড়া এ বাড়িতে আর কারো জানা সম্ভব নয়। সেফ ভাঙা হয়নি। শোবার ঘর, সিঁড়ির মুখের ডালাও অটুট, নিচে স্বয়ং বীর বাহাদুর পাহারায়, অথচ সেফের মধ্যে থেকে নক্সা উধাও, তাই না কর্ণেল?

—সত্যিই তাই। এ যে অবিশ্বাস্য ঘটনা।

—ভোজবাজীতে আমি বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা, কোনও গুপ্তপথে নিশ্চয়ই এটা অদৃশ্য হয়েছে। সে পথ কি, তা আমাকে জানতেই হবে।

—আমিও ত তাই ভাবছি।

—আচ্ছা, আজ সকালে কোনও সময় কি আপনি সেফ খোলা রেখে এ ঘরের বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন? অন্ততঃ মুহূর্তের জন্যও? চোর হয়ত সেই মুহূর্তটির সদ্ব্যবহার করেছে।

—না, না, এ অসম্ভব। হতেই পারে না।

বলতে বলতেই হঠাৎ যেন কর্ণেল কি একটা কথা মনে করে থেমে গেলেন।

—কি হলো কর্ণেল?

—একটা কথা মনে পড়ল হঠাৎ।

—কি কথা বলুন?

—এ কথাটা আমার মনে হয়নি কেন, তাই আশ্চর্য লাগছে। বলে তিনি লজ্জিতভাবে মাথা নামালেন।

দীপক বললেন—কোথায় গেছিলেন কর্ণেল, তা বলুন। নিচে গেছিলেন?

—অবশ্যই নয়। হেসে বললেন কর্ণেল।

—তবে?

—আমি গেছিলাম পাশের ঘরে। লাইব্রেরীতে।

—কেন?

—ফোনটা যে ওঘরে আছে।

—ফোন? কার ফোন? কিসের ফোন?

কর্ণেল বললেন—কার ফোন তা ত জানি না।

দীপক বললে—হেঁয়ালী ছেড়ে আসল কথাটা বলুন কর্ণেল বিশ্বাস। মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে।

নিজেকে সামলে নিলেন কর্ণেল।

কড়া মিলিটারী ডিসিপ্লিনে তাঁর মেরুদণ্ড যেন খাড়া হয়ে উঠল।

তিনি বললেন—ব্যাপারটা কি ঘটেছিল তা বলছি। আজ সকালে ছয়টা নাগাদ আমি সেফ খুলে নক্সাটা যথাস্থানে আছে কি না তা দেখছিলাম এবং দিল্লী যাবার কথা চিন্তা করছিলাম—এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

দীপকের চোখ যেন জ্বলে উঠল। সে বললে—আপনি আলমারি খুলে রেখেই পাশের ঘরে গেলেন, তাই নয় কি?

—হ্যাঁ, বন্ধ করতে ত বেশ সময় লাগে। তা ছাড়া ফোনটা বেজে চলেছিল অবিরাম। তাই—

—ভেতর থেকে এ ঘরের দরজা কি বন্ধ ছিল?

—না।

—আপনি সোজা গেলেন পাশের ঘরে?

—ঠিক তাই।

—কতক্ষণ সময় লাগল?

—মাত্র মিনিট খানেক।

—কে ফোন করেছিল?

—ফোন বাজছিল ঘন ঘন। কিন্তু যখন ফোন ধরলাম, দেখি কোনও উত্তর নেই।

—সে কি কথা।

—হ্যাঁ, বোধহয় রং-নাম্বার হয়েছিল।

দীপক হাসল।

—হাসলেন যে?

—কারণ আছে।

—কি কারণ?

—মানে আপনাকে ফোন করা হয়েছিল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।

—সেকি!

—হ্যাঁ। আপনাকে ফোন করেছিল ওদেরই লোক।

—তার মানে?

—মানে ওরা একজন নয়—ওদের মধ্যে এটা প্ল্যান করা ছিল। ষড়যন্ত্রকারীদের একজন চুরির উদ্দেশ্যে, আর একজন ফোন করেছিল আপনার মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য। আপনি ওঘরে গেলেন ফোন ধরতে, আর ইত্যবসরে অন্য একজন কাজ হাসিল করে পালিয়ে গেল।

—কিন্তু রং নাম্বার হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?

—না। আমার মনে হয় এটই পূর্বকল্পিত।

—কেন তা বলছেন?

—ঠিকই বলছি। আপনি কি ফোন করে ঘুরে এসে নক্সাটা দেখেছিলেন?

—না। তখন দেখি ড্রাইভার রমানাথ গাড়ি বের করে আমাকে খুঁজছিল হর্ণ বাজিয়ে।

ক্যাপ্টেন ঘোষ চুপ করে কথাটা শুনছিলেন।

তিনি বললেন—তা হলে দীপকবাবু, আপনার ধারণা ফোন করেছিল ষড়যন্ত্রকারীদেরই একজন?

কর্ণেল বললেন—তার মানে নক্সা চুরি করার ষড়যন্ত্র!

—ঠিক তাই। দীপক বললে, আপনি ফোন করতে ওঘরে গেলেন, আর চোর এই অবসরে চুরি করে নিয়ে গেল।

—অসম্ভব! আমার চোখ এড়িয়ে চোর ঢুকবে কি করে?

—চোর যদি আগেই এ ঘরে লুকিয়ে থাকে—তাহলে?

—আগে থেকে লুকিয়ে—

—হ্যাঁ, ঘটনা পরম্পরায় ত তাই মনে হচ্ছে। আর আমার যুক্তি যে ঠিক তার প্রমাণ ওঘরে টেলিফোনের অবস্থান।

—তার মানে?

—মানে এ ঘরে যখন ফোনে কথা বলছিলেন, তখন এখান থেকে ওঘরে আলমারিটা দেয়া যায় না। তাই নয় কি?

—তা বটে।

একটু পরে কর্ণেল বললেন—কিন্তু এঘরে লুকোবার জায়গা কোথায়?

—একটা জায়গা আছে, দেখুন।

বলে দীপক উবু হয়ে বসে পড়ল।

—কি দেখছেন?

—দেখছি খাটের তলায় ঐ জায়গাটা।

বলে দীপক পকেট থেকে টর্চ বের করে নিচের জায়গাটা ভাল করে দেখতে লাগল।

ক্যাপ্টেন ঘোষ আর কর্ণেল বিশ্বাস অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন তার কাজকর্ম।

।। আট ।।

জিজ্ঞাসাবাদ

উদ্বেগভরা কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল।

তারপর দীপক মুখ তুলে বললে—যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই।

—কি ভেবেছিলেন দীপকবাবু?

—বলছি। কর্ণেল বিশ্বাস, আসুন ত এদিকে—ঐ দেখুন।

অনেক কষ্টে বিশাল দেহটা নিচু করলেন কর্ণেল বিশ্বাস।

ক্যাপ্টেন ঘোষও তাকালেন।

দীপক টর্চটা ফোকাস করে বললে—বহুদিন খাটের তলাকার ধুলো পরিষ্কার না হওয়াতে একটা আস্তরণ জমে গেছে।

—দেখছি ত।

—এর কারণ কি জানেন?

—তা ত জানি না।

—এ ঘর পরিষ্কার করে কে?

—ভরত সিং। কিন্তু কেন?

—চোর লুকিয়েছিল এই খাটের নিচেই।

—সেকি!

—দেখছেন না? খাটের নিচে মাঝের অংশটা পরিষ্কার। চোর চুপ করে লুকিয়েছিল।

—কেন?

—সে সুযোগের অপেক্ষা করছিল।

ক্যাপ্টেন ঘোষ বললেন—বা, চমৎকার বিশ্লেষণ।

দীপক বললে—আপনার ঝাঁটা আছে কর্ণেল?

—ঝাঁটা?

—হ্যাঁ।

—বারান্দায় আছে হয়তো।

—দেখি।

বারান্দার কোণে রাখা ঝাঁটাটা নিয়ে এলো দীপক। উবু হয়ে হাত বাড়িয়ে খাটের নিচের সবটুকু ধূলো ঝাঁট দিয়ে বের করে আনলে সে।

তারপর পকেট থেকে ম্যাগানিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে লাগল ধুলোটা।

মিনিট পাঁচেক পর।

ক্যাপ্টেনঘোষ দেখলেন দীপকের মুখ যেন সাফল্যের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ধুলোটা সে টুকরো সাদা কাগজের উপর রাখল।

বিস্মিত কর্ণেল বিশ্বাস লক্ষ্য করলেন, কাগজের রাখা কতকগুলো ছোট চুল পরীক্ষা করছে দীপক।

ম্যাগনিফাইং লেন্স দিয়ে দেখে প্রতিটি চুলের দৈর্ঘ্য মাপল দীপক!

মৃদুস্বরে সে বললে—প্রতিটি চুল দুই সেন্টিমিটার লম্বা। দামী ক্যাস্টর অয়েল মাখে লোকটা, সদ্য সেলুন থেকে চুল ছেঁটেছে সে। মাথার চুলগুলো চুলের রোগে উঠে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

দীপকের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে কর্ণেল পরিচিত ছিলেন না।

তিনি তাই একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন—দেখছি গল্পের শার্লক হোমসের মত মনগড়া নানারকম কথা বলছেন আপনি।

দীপক একটু যেন বিরিক্তভরে বললে—কথাগুলো যে সত্যি তার প্রমাণ চান?

—বলুন।

—মাপের প্রমাণ আশা করি চান না। ঘ্রাণেন্দ্রিয় একটু তীক্ষ্ণ হলেই গন্ধটা টের পাওয়া যায়। ক্যাস্টর অয়েলের মৃদ্যু গন্ধ পেলাম। আমার লেন্স দিয়ে দেখুন, চুলের ওপরের দিকটা কি রকম শার্প—মানে চুলটা সদ্য কাটা হয়েছে। আর চুলের মোটা দিকটা গোড়ার বাল্‌ব নিয়ে খসে পড়েছে—তার মানে লোকাটার চুল উঠে যাচ্ছে। তা ছাড়া চুল না উঠলে, খাটের নিচে দু-এক ঘণ্টা বসে থাকার মধ্যে এতগুলো চুল উঠলো কি করে?

—বাঃ, সুন্দর বিশ্লেষণ ত!

—হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই চোরের বিষয়ে একটা আঁচ আমরা পেয়ে গেছি খানিকটা বটে। আর বাকীটুকুও পাব আপনার হাউস স্টাফদের একে একে আমার সামনে এনে হাজির করলে।

—হাউস স্টাফ? কিন্তু তারা সবাই যে পুরোনো ও বিশ্বাসী লোক!

বাধা দিলেন ক্যাপ্টেন ঘোষ। বললেন—উনি যখন তদন্ত করছেন, করুন—বাধা দেবেন না।

—তা বটে।

বলেই কর্ণেল উচ্চকণ্ঠে দিলেন—বীর বাহাদুর, ইধার আও— .

—জী সাব!

নিচ থেকে হাঁক ভেসে এলো।

একটু পরেই এলো বীর বাহাদুর, ভারী বুটের শব্দ তুলে।

সঙ্গে এলো একটু কুকুর।

বিরাট অ্যালসোসিয়ান। সে দীপকের কাছে এসে সন্দিগ্ধভাবে তার পায়ের ঘ্রাণ নিল।

কর্ণেল বললেন—টেরার! বৈঠ্ যাও!

সঙ্গে সঙ্গে সে বসে পড়ল। তারপর জিভ বের করে হাঁপাতে লাগল।

দীপক বীর বাহাদুরের মাথার দিকে তাকাল। বিরলকেশ লোক—মাথায় টাক। যা দু'চারটে চুল আছে তাও অন্তত চার ইঞ্চি লম্বা।

দীপক বললে—এ লোক নয়। বীর বাহাদুর তুমি একবার ভরত সিংকে নিয়ে এস।

বীর বাহাদুর তাকাল কর্ণেলের দিকে। কর্ণেল অনুমোদন করলেন ঘাড় হেলিয়ে। তখন সে চাবি নিয়ে চলে গেল। একটা ঘরে ও বন্ধ ছিল নিচে।

একটু পরে ভরত সিং ঢুকল। পালোয়ানের মত তার চেহারা। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা।

দীপক তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে—কতদিন কাজ করছ ভরত সিং?

—বারো সাল হুজুর।

—মুলুক কিধার?

—ভাগলপুর জিলা।

—সাহেবের ঘর ভাল করে ঝাঁট দাও না কেন?

—জী?

—দেখ খাটের নিচে কত ধুলো ছিল।

এর উত্তরে ভরত সিং জানালো, রোজ ঘর ঝাঁট দেয় বটে, তবে খাটের নিচে ঝাঁট দিতে ভুলে যায়। যাই হোক ভবিষ্যতে এমন ভুল আর হবে না।

—ঠিক আছে, যাও। এখন তাড়াতাড়ি যদুনাথ অধিকারীকে পাঠিয়ে দাও।

—সেলাম হুজুর।

—সেলাম।

—ডান হাতটা কর্ণেলের নাকের কাছে এসে দীপক বললে—লোকটা মাথায় সরষের তেল মাখে। চুল উঠছে না। আর চুলের দৈর্ঘ্য খুব ছোট—এক সেন্টিমিটারের বেশি নয়।

কর্ণেল চুপ করে রইলেন।

বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘরে প্রবেশ করল যদুনাথ।

যদুনাথ তার মুখের পানের রঙ মুছে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করেও সফল হয়নি। পরিষ্কার কামানো মুখ তার। মাথায় বিরাট বিরাট বাবরি চুল। একটা ঝুঁটি বাঁধা।

সে এসে হাত জোর করে বললে—মু কিচ্ছি জানে না সাহাব।

দীপক বললে—ও কতদিন কাজ করছে?

—প্রায় দশ বছর।

—তুমি এবার যেতে পার যদুনাথ।

—আচ্ছা সাহাব।

সে আভূমি প্রণাম করে প্রস্থান করলে ঘর থেকে ধীর পায়ে।

—ড্রাইভার রামনাথকে পাঠিয়ে দিও যদুনাথ।

—আচ্ছা সাহাব।

দীপক বললে—এ যে অপরাধী নয় তা বুঝতে পেরেছেন বোধ হয়?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে। এবারে পরবর্তী লোকটিকে দেখলেই নিশ্চিন্ত হবো। সেও না হলে ধরে নিতে হবে যে, বাইরের কোনও লোকই একাজ করেছে।

—তা ঠিক।

।। নয় ।।

নক্সা চোর

রামনাথ ঘরে প্রবেশ করতেই টেরার হঠাৎ দাঁড়াল। তার গলা থেকে শব্দ বের হতে লাগল—গর-গর....

সে কয়েক পা এগিয়ে গেল রামনাথের দিকে। রামনাথ দরজা ঘেঁষে দাঁড়াল।

দীপক বললে—আপনার কুকুর টেরারের সঙ্গে দেখছি রামনাথের সদ্ভাব নেই।

কর্ণেল বললেন—তাই ত দেখছি। কিন্তু আগে এমন ছিল না। খুব ভাব ছিল দু'জনে।

—কতদিন এমন দেখছেন?

—প্রায় দু'মাস।

দীপকের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

সে ক্যাপ্টেনকে বললে—এই রামনাথই চোর—ওই চুরি করেছে সামরিক গোপনীয় নক্সা। খবরদার রামনাথ—

রামনাথ দ্রুত পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই টেরার তার উপরে পড়ল ঝাঁপিয়ে। সে পড়ে গেল মেঝেতে।

রামনাথের পকেটে থাকা রিভলভারের গুলি পকেট ভেদ করে পাশের দেওয়ালে লাগল। মুহূর্তে ঘটে গেল ব্যাপারটা।

দীপকও তার রিভলবার তাক্ করেছিল রামনাথের উপরে।

কর্ণেল এক মুহূর্তে হতবুদ্ধি হলেও সম্বিত ফিরে পেয়ে হাঁক দিলেন—বীর বাহাদুর!

—সাহাব!

—বাঁধে উসকো!

নিমেষের মধ্যেই বীর বাহাদুর রামনাথকে বেঁধে ফেলল।

দীপক তার পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে আনল। বললে—এটি ফায়ার করার জন্যে রেডি ছিল দেখছি। রেডি হয়েই ঢুকেছে ও।

পিস্তলটা পরীক্ষা করে ক্যাপ্টেন ঘোষ বললেন—এ যে দেখছি বিদেশে তৈরী! এ অস্ত্র আপনার ড্রাইভার কি করে পেল কর্ণেল?

কর্ণেল এত বড় বিশ্বাসঘাতকতায় গভীরভাবে স্তব্ধ হয়েছিলেন। তিনি প্রচণ্ড একটা চড় মেরে বললেন—বল্ হতভাগা। একাজ করলি কেন? বিধবা মায়ের সন্তান, খেতে পাচ্ছিলি না—তোকে এত ভাল কাজ দিলাম। কত সুযোগ দিলাম সামরিক বিভাগে—দু'এক বছর পরে তোর মাইনে হতো মাসে অন্ততঃ সাড়ে তিনশো টাকা। আর তুই কিনা এভাবে—বল্ নক্সা কোথায়?

এতক্ষণ পরে মুখ খুলে রামনাথ বললে—নক্সা। কিসের নক্সা?

—ন্যাকামি রাখ! এই স্টিল সেফ্ থেকে নক্সাটা চুরি করেছিস্, বল্ কোথায় রেখেছিস?

—আমি কি ঐ আলমারি খুলতে পারি স্যার?

রামনাথের স্বরে দৃঢ়তার আভাষ। কর্ণেল চুপ।

দীপক বললে—তাহলে এ পিস্তলটা পেলে কোথায় বল? আর এটা নিয়ে এ ঘরে এসেছিলে কেন?

—আমাদের এ পথে সব সময় বিপদ। তাই এটা সঙ্গে রাখতে হয়।

—কিন্তু এঘরে বিপদের আশঙ্কা ছিল না। আর সেফ্‌টি ক্যাচ দিয়ে রাখনি কেন?

—কে বললে বিপদ ছিল না? ঐ কুকুরটা হরদম আমার টুঁটি টিপে ধরবার চেষ্টা করে।

—কিন্তু দু'মাস আগে তো সে তোমার অনুগত ছিল। এখন এমন করে কেন?

—তা আমি জানব কি করে?

—গুলি তাহলে তুমি কুকুরকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—মিথ্যা কথা কর্ণেল। ঐ গুলির লক্ষ্য ছিলাম আমি। টেরার ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে রক্ষা করেছে। তবে আমিও প্রস্তুত ছিলাম।

কর্ণেল রেগে বললেন—অকৃতজ্ঞ পশু—বিশ্বাসঘাতক!

রামনাথ বললে—ঐ টিকটিকিটার কথা ছাড়া, কোনও প্রমাণ নেই আমার বিরুদ্ধে স্যার। অনর্থক আমাকে কেন গালাগালি দিচ্ছেন?

দীপক রেগে উঠল। বলল প্রমাণ দেখতে চাও? বিদেশে তৈরী পিস্তল তুমি কোথায় পেলে? বিদেশী দূতাবাসে? এটা যে রেখেছ তা কি কর্ণেলকে বলেছ?

—না!

—আচ্ছা, চুল ছাঁটলে কবে?

বলে সে তার চুলের ঝুঁটি ধরে একটা টান দিল।

চুলের সঙ্গে নক্সা চুরির কি সম্পর্ক থাকতে পারে তা ভেবে পেল না রামনাথ, সেবললে—গত পরশু।

এবার তার ডান হাতটা কর্ণেল ও ক্যাপ্টেনকে দেখাল দীপক। বললে—দেখুন, চুল উঠে যাচ্ছে। এবং দুই সেন্টিমিটার লম্বা। সদ্য কাটা। এই দেখুন চুলে মিষ্টি সেন্টের গন্ধ।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন দু'জনে।

দীপকের কথা ঠিক।

ক্যাষ্টর অয়েলের মিষ্টি সুগন্ধ চুলে।

কর্ণেল বললেন—আপনার কথাই ঠিক দীপকবাবু।

।। দশ ।।

কে এই লোকটা

দীপক এবার বললে—এই গুপ্তচর মশাই বেশ সৌখিন লোক। চুলে দামী তেল মাখে।

—তাই ত দেখছি। বললেন কর্ণেল—কিন্তু গুপ্তচর মানে? আমার কাছে পনের বছর কাজ করছে।

দীপক হাসল। বললে—কে কাজ করছে? রামনাথ? এ সে রামনাথ নয়।

—তার মানে?

—মানে এর চেহারা ঐ রকম হলেও অন্য লোক গত দু'মাস ধরে কাজ করছে।

—সেকি!

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় তা এত বেশি চমকে উঠতেন না।

তার কথা শুনে রামনাথ যেন চমকে উঠল। মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

একটু পরে কর্ণেল বললেন—তা হলে এ কে? আসল রামনাথ কোথায়? এ কি করে এখানে এলো?

—অনেকগুলো প্রশ্ন। উত্তর দিতে সময় লাগবে। তবুও যথাসাধ্য বলছি। এ লোকটি আসলে বিদেশের একজন গুপ্তচর। রামনাথকে বন্দী বা হত্যা করে এখানে ঢুকেছে গুপ্তচরের কাজ করার ইচ্ছায়। আপনার প্রকৃত পরিচয় আর গোপন নেই কর্ণেল।

ক্যাপ্টেন ঘোষ বললেন—আপনার তদন্ত পরিচালনার প্রতিটি কাজে চমক আছে দীপকবাবু। কিন্তু এই লোক যে প্রকৃত রামনাথ নয়, তা কি করে আপনি বুঝলেন?

—তার প্রমাণ টেরার। এ আমাদের ধোঁকা দিলেও টেরার তার গায়ের গন্ধ শুঁকে ধরেছে যে, এ প্রকৃতপক্ষে রামনাথ নয়। তাই যে সন্দেহ করে আসছে একে দু'মাসআগে থেকেই, আর তাই এর সঙ্গে তার অসদ্ভাব। কুকুর ঠিকই চিনতে পারে কে আসল, কে নকল।

—তা বটে।

—আচ্ছা, আপনার বাড়ির হাউস স্টাফদের কোনও ছবি মানে ফটো তোলা থাকে না কর্ণেল?

—থাকে। টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে প্রত্যেকটি হাউস স্টাফের ফটো তোলা আছে।

—সেটা বের করে মিলিয়ে নিন ত!

কর্ণেল টেবিলের ড্রয়ার খুলে প্রত্যেকটি হাউস স্টাফের ফটো পেলেন—কেবল রামনাথের ফটো নেই।

দীপক বললে—বুঝলেন কিছু?

—কি?

—নকল রামনাথ চালাক। তাই এসেই সবার আগে তিন কপি ফটো সরিয়েছে।

—তাই ত দেখছি!

—লোকটা বুদ্ধিমান। মানে মানুষের চোখকে সামান্য একটু মেক্ আপে ভোলান যায়—কিন্তু ক্যামেরার চোখকে অত সহজে ঠকান যায় না। তাই এ কাজ সে এখানে ঢুকেই করেছে। কি বল হে নকল রামনাথ?

লোকটি কোন কথা বললে না।

কর্ণেল বললেন—এবারে কি করতে হবে?

—চলুন ওর ঘর সার্চ করি। যদি নক্সাটা বাইরে না গিয়ে থাকে, তবে ওর ঘরে ঠিকই পাওয়া যাবে।

—তা বটে।

—চলুন আমরা ওর ঘরে গিয়ে দেখি।

—তাই চলুন।

সকলে চলল রামনাথের ঘরের দিকে। রামনাথকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো। আর সবার আগে চলল টেরার।

রামনাথের ঘরটা সুন্দরভাবে সাজানো। টেবিলে স্নো, পাউডার, সেন্ট। দীপক দেখল সেখানে দামী ক্যাষ্টর অয়েল।

সর্বত্র খোঁজা হলো।

ফটোর পেছনে, টেবিলের ড্রয়ারে, পাওয়া গেল নানা টুকরো কাগজে সাংকেতিক ভাষায় নানা কথা লেখা।

দীপক বললে—দেখুন, রীতিমত গুপ্তচরগিরিও চালিয়ে যাচ্ছিল এই লোকটা।

স্যুটকেসের তলায় খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তা কেটে ফেলল দীপক।

বের হলো একটা গুপ্ত ফোকর। তার মধ্যে পাওয়া গেল কারেন্সী নোট।

দীপক গুণে দেখল, বারো হাজার টাকা। বললে—এ সবই গুপ্তচরবৃত্তি করে লোকটা উপার্জন করেছে গত দু'মাসে।

কর্ণেলের চোখ যেন রাগে লাল হয়ে উঠল। তিনি বেশি কথা বলতে পারলেন না।

সাংকেতিক ভাষায় লেখা আরও দু'তিনটে কাগজ বের হলো কিন্তু নক্সাটা পাওয়া গেল না।

দীপক গলদঘর্ম হলো—তবু নক্সা মিলল না কোন স্থানেই।

কর্ণেল বললেন—নক্সা কি তবে নেই?

দীপক চিন্তা করতে লাগল। সে দেখল টেরার বার-বার টেবিলটার চারপাশে ঘুরছে। সে তাই বললে—দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে। বলে সে টেবিলের দিকে মন দিল।

।। এগারো ।।

রহস্যভেদ

টেবিলে নানা ধরনের বই। সব সস্তা দামের নভেল বা সিনেমা পত্রিকা।

প্রতিটি পত্রিকা খুলে সার্চ করলে দীপক। কিন্তু নক্সা পেল না সে।

সে চিন্তা করতে লাগল।

তাকিয়ে দেখে, রামনাথের মুখটা যেন শুকিয়ে গেছে। ম্যাগনিফাইং লেন্স দিয়ে দীপক ভালকরে পরীক্ষা করতে লাগল।

কোনও বই-এর দু'টি পাতা একসঙ্গে জোড়া আছে কিনা তা পরীক্ষা করল দীপক। তবুও সে ব্যর্থ হলো।

দীপকের ব্যর্থতা দেখছিল। আর মনে মনে যেন খুশি হয়ে উঠছিল রামনাথ।

তারপর দীপক হঠাৎ একটা জিনিস লক্ষ্য করল।

প্রতিটি বই-এর কভারে নানা ধরনের সুন্দর ছবি—কিন্তু একটা বই-এর ওপর খবরের কাগজের আর একটা মলাট দেওয়া আছে। সেটা একটা যৌন-পত্রিকা।

দীপক ভাবল, সব বইয়ের মলাটই রুচিকর, সুন্দর ও মোহময়। তাহলে এর মলাট আবৃত কেন?

সে আপন মনে বলে উঠল—ইউরেকা এবার পেয়েছি।

কর্ণেল বললেন—কোথায়?

দীপক বললে—দেখুন না।

মলাটটা খুলে ফেলল দীপক।

খবরের কাগজ দু'ভাজ করে, তা দিয়ে বইটায় মলাটা দেওয়া আছে।

দীপক মলাটটি খুলে ফেলল। তারপর ভাঁজ খুলে দেখে তার মধ্যে সযত্নে রাখা ছোট্ট একটা নক্সা।

দীপক বললে—দেখুন ত কর্ণেল?

কর্ণেল আনন্দে যেন লাফ দিয়ে উঠলেন। বললেন—হ্যাঁ, এই ত সেই নক্সা। আঃ, কি আনন্দ। দীপকবাবু! আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব।

দীপক হেসে বললে—ধন্যবাদ পরে দেবেন, এখন এক কাপ কফি খাওয়ান ত।

—নিশ্চয়।

তিনি তক্ষুণি যদুনাথকে তিন কাপ কফি তৈরী করতে বললেন।

দীপক বললে—যাই বলুন, খাসা মাথা কিন্তু আপনার এই নকল রামনাথের। লুকোবার জায়গাটা মাথা খাটিয়ে ভালই বের করেছিল। তবে একটা ভুল করেছিল সে। অন্য কোন পত্রিকা বা বইতে মলাট নেই—একটাতে মলাট কেন? এতেই আমার সন্দেহ দৃঢ় হলো। আর তাই—বলে হেসে উঠল।

নকল রামনাথকে বন্দী করে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো।

থানার অফিসার তাকে প্রশ্ন করলেন—এবার বল আসল রামনাথ কোথায়?

—জানি না।

দীপক বললে—এভাবে হবে না স্যার। ভাল রকম দাওয়াই দিতে হবে।

তক্ষুণি তাকে ধরে বেশ ঘা কতক ধোলাই দেওয়া হলো। তবু সে নীরব।

তখন দীপক ভয় দেখাবার জন্যে বললে এভাবে না হলে এর দেহের একটি একটি করে আশ কেটে ফেলুন। মরে যায় ক্ষতি নেই, তার জবাব দেব আমরা—

মানে কর্ণেল দেবেন।

তখন ধারাল ছোরা আনা হলো।

দীপক বললে—প্রথমে একটি একটি করে হাতের ও পায়ের মোট বিশটি আঙ্গুল কেটে ফেলুন।

রামনাথ বললে—এভাবে অত্যাচার না করে, মেরে ফেলুন স্যার আমাকে।

—না। এভাবেই হবে। তারপর একটি একটি করে হাত ও পা কেটে ফেলা হবে। তারপর নাক কান।

ভয় পেয়ে রামনাথ বললে—না-না, বলছি।

—বল।

—তাকে আমরা ক'জন গুপ্তচর মিলে মেরে ফেলেছি!

—কোথায়?

—কর্ণেলের বাড়ির কাছে গাছের নীচে।

তক্ষুণি দীপক ছুটল অফিসার ও অন্য সবাইকে সঙ্গে নিয়ে।

রামনাথকে থানায় বন্দী করে রাখা হলো।

নিঝুম পথ।

সেই পথে এসে গাছটার নীচে ভাল করে সার্চ করতে লাগল দীপক।

এক জায়গায় দেখে পথের পাশে ঝোপের ক'টি গাছের পাতায় রক্তের দাগ কালো হয়ে শুকিয়ে রয়েছে। দীপক বললে—এই ত রক্তের দাগ!

সেখানে টেরারকে ছেড়ে দেওয়া হলো। সে গন্ধ শুঁকে শুঁকে কিছুটা এগিয়ে একটা জায়গায় এসে মাটি শুঁকে পা দিয়ে আঁচড়াতে লাগল।

সেই জায়গাটা খোঁড়া হলো।

মাটির তলা থেকে বের হলো আসল রামনাথের মৃতদেহটা। সেটা পচে গলে গেছে। তাকে তৎক্ষণাৎ তুলে এনে সৎকারের ব্যবস্থা করলেন কর্ণেল।

তারপর দুঃখিত কণ্ঠে বললেন—আমার কাজ করতে গিয়েই বেচারা প্রাণ দিল।

তারপর নকল রামনাথকে তন্ন তন্ন করে জেরা করা হলো—কার প্ররোচনায় সে বিদেশী শত্রুর গুপ্তচরবৃত্তি করছিল?

অত্যাচারের ভয়ে সে স্বীকার করল যে, সে এককালে ড্রাগনের দলে ছিল। কিন্তু তার দেশদ্রোহিতার জন্য ড্রাগন তাকে দল থেকে বিতাড়িত করে।

কথাটা দীপক বা মিঃ গুপ্ত অবিশ্বাস করতে পারলে না। হয়তো লোকটার কথা সত্যি!

দীপক বললে—ড্রাগনের দল ছেড়ে তুমি তাহলে এই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকতার কাজ শুরু করেছিলে, তাই নয় কি?

—হ্যাঁ।

—এতে তোমার লাভ কি হলো?

—এ পথে বেশি উপার্জন করা সম্ভব হয় অতি সহজে, এটাই লাভ।

—তোমার মত দেশদ্রোহীকে গুলি করে মারা উচিত।

লোকটা কোনও উত্তর দিলে না।

দীপক বললে—ড্রাগন কোথায় এখন থাকে বা কিভাবে কাজে করে তা জান?

রামনাথ চুপ করে রইল।

একটু পরে দীপক বললে—ড্রাগন কোথায়?

—সে বোধহয় বিশালগড়ের একটি পোড়াবাড়ির পাতালপুরীতে অবস্থিত গুপ্তকক্ষে রয়েছে।

দীপক তৎক্ষণাৎ সদলে রওনা হলো সেদিকে।

।। বারো ।।

পাতালপুরীতে ড্রাগন

কোলকাতা থেকে প্রায় বাইশ মাইল দূরে একটা গ্রামের প্রান্তে জঙ্গলের মধ্যে বিশালগড়ের প্রাচীন প্রাসাদ। এটা পোড়োবাড়ি।

লোকে বলে হানাবাড়ি।

বনজঙ্গলে বাড়িটি আবৃত। দীপক তন্ন তন্ন করে সারাটা বাড়ি এবং তার চারপাশে খোঁজ করলে—তবু ড্রাগনের কোন পাত্তা পেলো না তারা। ড্রাগন তবে গেল কোথায়? সে কি আজ এখানে নেই?

অবশেষে একটা ছোট ঘরে আবিষ্কৃত হলো এক সুড়ঙ্গ পথ। সেই পথ দিয়ে দীপক, রতন ও মিঃ গুপ্ত সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলেন। সুড়ঙ্গের শেষে একটা ঘর। সেখানে ড্রাগন ও তারদলের পরিত্যক্ত কিছু জিনিসপত্র পাওয়া গেল।

বোঝা গেল ড্রাগনের দল এখানে ছিল—তবে অনেক আগেই এখান থেকে পালিয়ে গেছে।

দীপক দেখল, ঘরে সে সব জিনিসপত্র পড়ে আছে, তা থেকে এদের কোনও সূত্র পাওয়া যাবে না। তবু যে সব জিনিসপত্র কাগজের টুকরো প্রভৃতি যা পেলো, সব একটি থলিতে ভর্তি করে নিল।

মিঃ গুপ্ত বললেন—ড্রাগন কি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল যে আমরা আসব?

—তাই ত মনে হয়।

—কিন্তু কি করে জানল যে, আমাদের এই দুঃসাহসিক অভিযান আজই ঘটবে?

—তা আমি জানি না। তবে মনে হয়, ওদের দলের কোনও গুপ্তচর নিশ্চয়ই ওদের গোপনে খবর দিয়েছিল।

সকলে লালবাজারে ফিরে এলো। দীপক তখন বসে বসে সুড়ঙ্গের মধ্যে পাওয়া টুকরো কাগজগুলো ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল।

কতকগুলো কাগজের টুকরো দেখে দীপকের মনে হলো, সেগুলো একটা কাগজই কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে।

দীপক টুকরোগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল। তারপর আঠা দিয়ে জুড়ে ফেলল। দেখল সেটা একটা নক্সা। তার নীচে সাংকেতিক অক্ষরে কতকগুলো কথা লেখা। দীপক অনেক চিন্তা করে লেখাগুলোর পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হলো।

তারপর মিঃ গুপ্তের দিকে চেয়ে বললে—ড্রাগন পালিয়ে গেছে বটে, তবে কোথায় কি উদ্দেশ্যে গেছে তা অনেকটা আন্দাজ করতে পারছি।

—কি ব্যাপার?

এটা—হলো, একটা খনির নক্সা। সাংকেতিক লেখা দেখে মনে হচ্ছে, এটা হলো মহীশূর অঞ্চলে একটা খনির নক্সা।

মিঃ গুপ্ত বললেন—মহীশূরের কোলার অঞ্চল ত স্বর্ণখনির জন্যে বিখ্যাত—তাই তো?

—তা জানি। আমার মনে হচ্ছে বিশেষ কোনও গোপন উদ্দেশ্যে ড্রাগন সেখানে গেছে। আমাদের কর্তব্য সেখানে গিয়ে তদন্ত করা। তবে কোলকাতা পুলিশ থেকে, মহীশূর পুলিশের বড় কর্তার নামে বিশেষ চিঠি লিখে নিতে হবে আমাকে—যাতে তাঁদের সাহায্য পাই।

—বেশ ত, সে ব্যবস্থা আমি করব মিঃ চ্যাটার্জি।

দীপককে রীতিমত চিন্তিত দেখায়।

কয়েকদিন পরে।

দীপক আর রতন মহীশূরের পুলিশ সুপারের নামে লেখা পরিচয়পত্র নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো। পুলিশ সুপার মিঃ জেম্‌স সব কথা শুনে ও পরিচয়পত্র দেখে দীপকদের সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হলেন।

পরের দিন সকালে দীপক আর রতন কোলারের দিকে যাত্রা করল।

নির্দিষ্ট অঞ্চলে এসে দীপক দেখল, সেই অঞ্চলে অনেকগুলো খনি রয়েছে। খনির কাজ চলছে পূর্ণ উদ্যমে। অজস্র লোক কাজ করছে—বিরাট বিরাট সব

কাণ্ড-কারখানা সেখানে। খনি থেকে সোনা বের করা রীতিমত দুরূহ পদ্ধতি, তাই অনেক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজকর্ম করা হচ্ছে।

নক্সাটা ভাল করে মিলিয়ে নিয়ে দীপক একটা সোনার খনিতে উপস্থিত হলো। তারা জানতে পারল এই খনির ম্যানেজার হলেন মিঃ আয়ার নামে একজন ভদ্রলোক। দীপক তাঁর সঙ্গে দেখা করল।

দীপকের পরিচয় শুনে ও পরিচয়-পত্রাদি দেখে মিঃ আয়ার খুশি হলেন। বললেন—আপনি কি চান বলুন?

দীপক বললে—আমি নিজে আপনার এই সোনার খনিটা একবার ঘুরে দেখতে চাই। যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

মিঃ আয়ার বললেন—না না, এতে আমার একটুও আপত্তি নেই। আজ বিকেল চারটে নাগাদ ডিউটি শেষ করে শ্রমিকরা চলে যাবে। তারপর আপনি যদি দেখতে চান, তাহলে আমি নিজে নিয়ে গিয়ে সব দেখাবো আপনাকে।

দীপক তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে তখনকার মতো বিদায় নিল।

স্থানীয় থানার অফিসারকে দীপক নিজের পরিচয়-পত্র দেখিয়ে সব বললে। তিনি বললেন—আপনি কি চান?

—আমি চাই প্লেন ড্রেসে আপনারা আমাদের পাহারা দেবেন।

—বেশ তাই হবে।

—তাহলে আজ বিকেল চারটে নাগাদ এই ঠিকানাতে আমি যাব—দূর থেকে আপনারা সব ওয়াচ করবেন। কেমন?

—ঠিক আছে।

দীপক বেরিয়ে গেল থানা থেকে।

বেলা চারটেতে দীপক খনির উপযুক্ত পোষাক পরে মাথায় ব্যাটারীযুক্ত লাইট লাগিয়ে, মিঃ আয়ারের সঙ্গে খনিতে নামল। মিঃ আয়ার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাতে লাগলেন।

হঠাৎ—

মিঃ আয়ার এক সময় একটা পড়ে থাকা গাঁইতি তুলে নিয়ে দীপকের মাথা লক্ষ্য করে প্রচণ্ড আঘাত করতে উদ্যত হলেন।

দীপক আড়চোখে দেখে নিয়ে সরে দাঁড়াল, আঘাতটা লাগল দেয়ালের গায়ে। দীপক সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল বের করে বললে—মাথার উপরে হাত তোল মিঃ আয়ার ওরফে ছদ্মবেশী দস্যু ড্রাগন। আসল মিঃ আয়ারকে সরিয়ে তার মতো হুবহু ছদ্মবেশ পরে বিগত কয়েকমাস ধরে তুমি বহু অর্থ আত্মসাৎ করেছ! কিন্তু আজ তুমি ধরা দিতে বাধ্য হলে। ড্রাগন হাত তুলে দাঁড়াল।

হঠাৎ দীপকের একটু অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ড্রাগন তাকে প্রচণ্ড লাথি

মারল। দীপকের হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাগন ছুটে গেল একদিকে। তারপর লিফটে চড়ে পাতালপুরী থেকে উপরে উঠে গেল। দীপক আটকে পড়ল পাতালপুরীতে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। পুলিশ অফিসার দেখতে পেলেন দীপক আর উপরে উঠছে না। তিনি তখন নিজেই এগিয়ে এসে পুলিশবাহিনীসহ লিফটে চেপে নীচে নামলেন।

দীপক এগিয়ে এলো। বললে—মিঃ আয়ার কোথায়?

—তিনি চলে গেলেন একটু আগে। বললেন—আপনি নাকি কি সব কাজে ব্যস্ত আছেন। অনেকক্ষণ গেল। আমি সন্দেহ করে অবশেষে নামলাম খনির মধ্যে।

দীপক বললে—উঃ, একটু ভুলের জন্যে ড্রাগন পালাল।

—কে ড্রাগন?

—ঐ ছদ্মবেশী আয়ার! আসল মিঃ আয়ার তার হাতে বন্দী ছিলেন। হয়তো তার বাড়ি খুঁজলে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে।

মিঃ আয়ারের বাড়ি ভালভাবে সার্চ করা হলো। অবশেষে বাড়ির একটা ঘর থেকে একজন শীর্ণকায় লোককে উদ্ধার করা হলো।

পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করলেন—আপনি কে?

—আমি মিঃ আয়ার। গত দু'টি মাস আমি এক শয়তানের পাল্লায় পড়ে এখানে বন্দী হয়ে আছি।

দীপক ধীরকণ্ঠে বললেন—সেই শয়তান আর কেউ নয়—দস্যু ড্রাগন।

পুলিশ অফিসারের মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হলো না।

ড্রাগন ও দস্যুনেত্রী চপলা

।। এক ।।

ভৈরবানন্দ ও নীলিমা

ভারতের বিখ্যাত তান্ত্রিক গুরু ও সন্ন্যাসী ভৈরবানন্দ অবধূত তাঁর নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন গঙ্গার ধারে—একটা নির্জন স্থানে। নাম ''আনন্দ আশ্রম''।

দেশের সর্বত্র তাঁর সুখ্যাতি। শিষ্যরাও প্রচুর আসে সেখানে সন্ন্যাসীজীর দর্শনে।

সেদিন বিকেলবেলা। স্বামীজী বসেছিলেন আশ্রমের ধ্যান কক্ষে। মেঝের উপরে

বিরাট চওড়া একটা ফরাস পাতা। তার ঠিক মাঝখানে একটা বাঘছাল। তার উপরে বলে ছিলেন তান্ত্রিক গুরু ভৈরবানন্দ। ঘরের কোণে একটা সিন্দুক ছাড়া আর কিছু নেই।

বয়স তাঁর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। সুগঠিত দেহ। সিঁদুরের বিরাট ফোঁটা কপালে। চন্দনচর্চিত ললাট থেকে যেন জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। প্রশান্ত চোখের দৃষ্টিতে যেন অদ্ভুত একটা আবেদন। পরনে রক্তবস্ত্র।

সাধুজীর পাশে রাখা ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল—ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—ভৈরবানন্দ রিসিভার তুললেন। বললেন—হ্যালো....হ্যাঁ, আমি আনন্দ আশ্রম থেকে বলছি। আমি ভৈরবানন্দ।

—কে, সাধুজী? আমি বিনয় চৌধুরী বলছি। আপনাকে একটা খুব জরুরী কথা জানিতে চাই। বিশেষ দরকারী।

—কি কথা?

—সে সব টেলিফোনে বলা উচিত নয়—বলবোও না। আমি আপনার সঙ্গে গোপনে দেখা করে জানাব—কেমন? দুপুরে আপনি কোথায় গেছিলেন?

—আমি একটু দরিদ্র ভবন পরিদর্শন করতে গেছিলাম। ঐ সঙ্গে অনাথ আশ্রমটাও ঘুরে এলাম। তা তোমার সেই জিনিসটা ত রেখেই গেছিলাম আমি। আমার ঘরের তোরঙ্গে রাখা ছিল—পাওনি?

—পেয়েছি।

—বিজয়া দেবী মিটিং-এর নোটিশ দিয়েছেন—তুমি পেয়েছ নিশ্চয়। পাওনি?

—হ্যাঁ, পেয়েছি। হঠাৎ আর্জেন্ট নোটিশ দিয়ে মিটিং কল্ করছেন কেন জানেন তা?

—না, জানি না। তুমি মিটিং-এ আসবে ত?

—আসব। মিটিং-এর পরে আপনার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলবো, কেমন?

—আচ্ছা।

সাধুজী টেলিফোন রেখে দিলেন।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল নীলিমা। বয়স তার প্রায় আটাশা হবে। পরনে সাদা ধুতি—অর্থাৎ সে বিধবা। স্বামীজীর একজন প্রধান শিষ্যা।

নীলিমা বললে—কে ফোন করেছিল?

ভৈরবানন্দ বললেন—বিজয়া। আচ্ছা নীলিমা, হঠাৎ কেন বিজয়া দেবী আনন্দ আশ্রমের সর্ব্বোচ্চ কমিটির কল্ করলেন, জান কিছু?

—আমি জানব কি করে?

—ওঁর চিঠির অর্থটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। আর একবার পড়ত—শুনি।

নীলিমা পড়তে লাগল চিঠিটা বের করে ঃ

এতদ্বারা আমি আনন্দ আশ্রমের সর্বোচ্চ কমিটির সদস্য ও সদস্যাদের অনুরোধ করছি, যেন তাঁরা সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আশ্রমের ধ্যানকক্ষে মিলিত হন। আনন্দ আশ্রমের মঙ্গলের জন্য আমি কমিটির সবার কাছে কয়েকটি অতি জরুরী সংবাদ জানাতে চাই। নমস্কারান্তে—বিনীতা—

বিজয়া দেবী।

ভৈরবানন্দ বললেন—জরুরী সংবাদ? কি এমন জরুরী সংবাদ যে, তা অবিলম্বে জানাতে হবে সকল সদস্যদের? কিছু আন্দাজ করতে পার নীলিমা?

—আন্দাজ কিছু করে লাভ কি? সব শোনা যাবে। আর আমি বিজয়া দেবীর ব্যাপারে নেই।

—মনে হচ্ছে, বিজয়া দেবীর উপরে তোমার খুবই রাগ হচ্ছে, তাই না?

—নিশ্চয়—একশোবার আছে। যেদিন থেকে ঐ মেয়েটা এখানে এসেছে আমি যেন দিনরাত বিরক্তি বোধ করছি।

—কিন্তু তুমিই ত তাকে এনেছিল। তাতে ত আশ্রমের মঙ্গলই হয়েছে।

—শুধু কি বিজয়া দেবীকেই এনেছিলাম? আরও কত ধনী শিষ্যাকে ত আমি এনেছি এখানে। এনেছি তোমার নির্দেশে—তোমার অর্থ উপার্জনের পথ সুগম করার জন্যে। কিন্তু কল্পনাও করিনি যে এদের কাউকে দেখে তোমার মনোবিকার জাগতে পারে। ভেবেছিলাম অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী হবার আগে তুমি যখন কেবল ভৈরব ভট্টাচার্য্য ছিলে, তখন যে আঠারো বছরের বিধবা মেয়েটি কুলে কালি দিয়ে তোমার সঙ্গে চলে এসেছিল, সেই নীলিমাই চিরদিন তোমার মনের রাজ্য জুড়ে থাকবে। কিন্তু ঐ মেয়েটা—মানে বিজয়া তেমার শিষ্যা হবার পর আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। বিজরাই এখন তোমার সব—দিনরাত তারই চিন্তা।

—উঃ, থামো নীলিমা। কি যা তা বকছো? কেউ শুনলে সর্বনাশ হতে পারে।

—সর্বনাশ হোকগে। আমি তোমার অলৌকিক শক্তির কথা, সাধুগিরির ওই ভড়ং সব ঘুচিয়ে দিতে পারি জান? লোকে জানুক যে তুমি একটা ভণ্ড।

—আরে, এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন? আগে সব ঘটনা শোনাই না।

—না, না, তোমার কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। আমি এখন বিজয়াই তোমার সব। ওকে ছাড়া তোমার চলে না।

—পাগল হয়েছ? আমি বিজয়া দেবীকে হাতে রাখতে চাই শুধু আর্থিক স্বার্থের জন্য। ওঁর সঙ্গে আমার অন্য কোনও সম্পর্ক নেই। এটা কি জানো না, উনিই মৃত স্বামীর সম্পত্তির মালিক এখন। কয়েক লক্ষ টাকা ওঁর আছে।

—জানি সব।

—গত সপ্তাহে উনি আশ্রমে কুড়ি হাজার টাকা দান করেছেন তা ত দেখেছ? আর উনি উইল করেছেন তাঁর সব সম্পত্তি এই আশ্রমের নামে। সে উইলের এক্সিকিউটর আমরা তিনজন—আমি, ধীরেন আর রবীন।

—সব জানি।

—তাহলে নিজেই ভেবে দেখো নীলিমা যে, আমি কেন এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশি তাঁর সঙ্গে। আমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। তোমার আসন ঠিকই আছে—চিরদিন থাকবে?

—তা বিজয়া দেবীর চিঠিটা পেয়ে এত ভাবনা কিসের?

—ভাবছি, নিশ্চয় একটা কিছু অঘটন ঘটছে। তা না হলে এত জরুরী সভা ডাকবেন কেন বিজয়া দেবী? যদি তিনি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেন ত মহা ক্ষতি হবে আমাদের। একথা ত জানো যে, আমি ধীরেন আর রবীন তিনজন মিলে ব্যবসার ভিত্তিতে এ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছি?

—লজ্জা করছে না এসব বলতে। তোমার শিষ্য-শিষ্যারা কেউ একথা শুনলে ঘৃণায় তোমাকে কি করবে জান?

—আহা, তুমি ত সব জান—তারা জানবে কেন?

—তোমার কীর্তি আমি সব জানি—না হলে আর জানতে কে? তন্ত্র-মন্ত্রের নানা অলৌকিক হাত সাফাই দেখিয়ে অবাক শিষ্য-শিষ্যা জড়ো করেছ তুমি। তারা সব ধনী—মোটা ডোনেশন পাচ্ছ। অথচ খরচ ত অতি সামান্য। শহরতলিতে লোক দেখানো একটা দরিদ্র ভবন, একটা অনাথ আশ্রম। বিরাট আয় তোমাদের। আয়ের টাকা সমান ভাগে ভাগ করে নিচ্ছ তুমি, ধীরেন আর রবীন। ভালই চলছে তোমাদের ধর্মের ব্যবসা। তা আবার বিজয়ার টাকার উপর নজর কেন?

—আবার ঈর্ষা! বিশ্বাস করো, ওর প্রতি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা আমার নেই।

—বিজয়া যে তোমার আধ্যাত্মিক শক্তি দেখে ভক্তিতে গদগদ হয়ে তোমাকে সব বিলিয়ে দিচ্ছে তা আমি বিশ্বাস করি না। তোমার সঙ্গে ওর গোপন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে নিশ্চয়। মেয়েদের আকর্ষণ করার শক্তি তোমার অসাধারণ।

—তুমি অনর্থক সন্দেহ করছ।

—না-না, তুমি জান, আমার সন্দেহ, মিথ্যা নয়। বিজয়াকে আমি সহ্য করতে পারি না—হয় সে এ আশ্রমে থাকবে, না হয় আমি থাকব।

—মাথা গরম করে কোনও সিদ্ধান্ত করো না নীলিমা। বিজয়া দেবীকে আমি আশ্রয় না দিলে আমার দুজন পার্টনার আমার উপরে ক্ষেপে উঠত। তার সঙ্গে আমার গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক—অন্য কিছু নয়। যাক, আমি যাচ্ছি স্নান করতে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসছি। মেম্বাররা এলে তাদের বসিও। আমি ঠিক সাড়ে ছটায় ধ্যানকক্ষে আসব।

ভৈরবানন্দ প্রস্থান করলেন।

নীলিমা আপন মনেই বললে—ভণ্ড কোথাকার। গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক। ফাঁকি দিতে চাও আমার চোখকে, তাই না? আমি সব বুঝি। আমার চোখ এড়াতে পারবে না। যাবে কোথায়?

বলতে বলতে সে এগিয়ে এলো। এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে নীলিমা চুপ করল।

।। দুই।।

বিজয়ার মৃত্যু

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল সাধুজীর এক নতুন শিষ্য হরিহর বিশ্বাস। সে বিজয়া দেবীর পূর্ব-পরিচিত। বিজয়া দেবী শিক্ষা নেবার পর সে দীক্ষা নেয়।

হরিহর বলল—নমস্কার নীলিমা দেবী।

—বিজয়া দেবীর মিটিং-এর নোটিশ পেয়ে এসেছেন নাকি আপনি?

—হ্যাঁ। সাধুজী কোথায়?

—তিনি গেলেন স্নান করতে। আমিও একটু যাচ্ছি ওদিকের কাজে। আপনি এখানে বসুন। সাধুজী ঠিক সাড়ে ছ'টায় ধ্যানকক্ষে আসবেন।

—আচ্ছা।

হরিহর বসল। তারপর বললে—আপনি মিটিং-এ যোগ দেবেন না?

—হ্যাঁ ঠিক সময়মত আসব।

নীলিমা চলে গেল।

হরিহর আপন মনে বলতে লাগল—আশ্চর্য ব্যাপার। বিজয়া হঠাৎ সভা ডাকল কেন, জানি না। আশ্রম নিয়ে বড় মাতামাতি করছে ও। শী ইজ গোয়িং টু হেল্।

এমন সময় বিজয়া দেবী প্রবেশ করলেন ঘরের মধ্যে। পরনে তাঁর সাদা জর্জেটের শাড়ি। বয়স আটাশ-ঊনত্রিশ হবে। চোখের দৃষ্টিতে অস্বস্তি, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

বিজয়া দেবী ঢুকেই বললেন—হু ইজ্ গোয়িং টু হেল্ হরিহরবাবু? কার কথা বলছেন?

—আমি তোমার কাছে 'হরিহরবাবু' করে হলুম বিজয়া? সারা জীবন 'তুমি'

'তুমি' বললে, এখন হঠাৎ 'আপনি' কেন?

—আপনি বলায় আপত্তি আছে নাকি?

—নিশ্চয় আছে। তোমার কি হলো বিজয়া?

—কিছুই ত হয়নি।

—তুমি আজকাল আমাকে একেবারে ভুলে গেলে?

—আপনাকে কি ভোলা যায়? আপনি আমার স্বামীর বন্ধু, তাঁর পার্টনার।

—তোমার স্বামীর বন্ধুভাবেই কি তোমার সঙ্গে পরিচয় আমার? তার মৃত্যুর পর কি তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়নি?

—ছি! ছি! এসব কি বলছেন হরিহরবাবু? বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা? আপনার মাথা ঠিক আছে ত?

—তুমি তাহলে এতদিন অভিনয় করেছ?

—এমন কথা বলবেন না। এসব আপনারই মনের গোপন ইচ্ছার রিফ্লেক্শন। আপনাকে এমন কোন কথা জানাইনি।

—কি নিষ্ঠুর কথা! উঃ—আমাকে তুমি রেজিষ্ট্রী করে বিয়ে করতে চাওনি?

—আমার ত মনে পড়ছে না।

—তা ত পড়বেই না। ভৈরবানন্দ তোমাকে নিশ্চয় হিপ্নোটাইজ্ করেছে। উঃ!

—আপনি বড্ড উত্তেজিত। আমি ওদিকের ঘরে যাচ্ছি, আপনি বসুন। এখন ছ'টা—মিটিং-এর আধঘণ্টা বাকি আছে এখনো।

বিজয়া, দেবী চলে গেলেন।

হরিহর নিজের মনেই বললে—আমার মনের মধ্যে যা হচ্ছে—আমাকে বঞ্চিত করে সাধুজীর জন্যে আত্মহারা হয়েছে এ আমি সহ্য করতে পারি না।

তারপর এলো ধীরেন বোস। বয়স চল্লিশের কিছ বেশি। মাথায় টাক। স্বাস্থ্য ভাল। বললে—এই যে হরিহরবাবু, আগেই এসে গেছেন দেখছি।

—বসুন। আমি একটু বাইরে থেকে আসি। একটা পান খেতে হবে মোড়ের দোকান থেকে।

হরিহর চলে গেলে ধীরেন বোস বিজয়া দেবীর চিঠিটা পকেট থেকে বের করে আবার পড়ে বললে নিজের মনে—কি এমন জরুরী সংবাদ বিজয়া দেবীর—ভেবে মাথা খারাপ হবার উপক্রম। কিছুই বুঝতে পারছি না।

এমন সময় রবীন মুখার্জী ঢুকল ধীর পায়ে। বয়স তার বিয়াল্লিশ। কালো শক্ত-সামর্থ চেহারা। বললে—একা একা বসে আছ দেখছি ধীরেন। আর কেউ আসেনি এখনো?

—হরিহরবাবু এসেছেন। পান খেতে বাইরে গেছেন। আচ্ছা রবীনদা—

—কি বলছ?

—বিজয়া দেবী হঠাৎ এই সভা ডাকলেন কেন?

—বুঝতে পারছি না। তুমি কিছু জান না?

—আমি জানবো কি করে? ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে ভালো মনে হয় না। বিজয়া দেবী ধনী মেম্বার। ভৈরবানন্দ ওঁকে চমৎকার ভাবে খেলিয়ে তুলেছে। ভাল কথা—গত সপ্তাহে বিজয়া দেবী যে বিশ হাজার টাকা দিয়েছেন তা আজ রাতেই ভাগাভাগি করে নিতে হবে। ভৈরবানন্দের সিন্দুকে ওটা ফেলে রাখার কোন মানে হয় না।

—বেশ। আমি কিন্তু বিজয়া দেবীর চিঠির কথা ভাবছি বার বার। ওঁর জরুরী সংবাদটা কি হতে পারে?

—আমার মনে হয়, ভৈরবানন্দ কিছু বিশ্রী কাণ্ড করেছে, যা তিনি জানতে পেরেছেন।

—অসম্ভব নয়।

—কিন্তু বিজয়া দেবী যদি আশ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে বুঝেছ?

—হয়ত বিশ হাজার টাকা ফেরত নেবেন। উইলও পাল্‌টে ফেলবেন। মহা-সর্বনাশ হবে।

—কিন্তু যাই হোক, টাকাটা ফেরত দেওয়া হবে না। কিছুতেই।

এমন সময় হরিহর প্রবেশ করল।

ধীরেন বললে—হরিহরবাবু, বিজয়া দেবী বোধহয় আশ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবেন।

হরিহর বিদ্রূপের সুরে বললে—মাথা খারাপ! সাধুজী বলতে সে অজ্ঞান

—এ ধারণা আপনার হলো কেন?

—আমার পার্সোনাল ব্যাপার প্রকাশ করতে পারি না আমি।

—আপনি না বললেও আমরা কিছু জানি।

—তাই নাকি? কি জেনেছেন?

—রাগ করবেন না ত?

—না-না, রাগ করব কেন? বলুন।

—বিজয়া দেবীর স্বামী আপনার বন্ধু ও ব্যবসায়ের পার্টনার ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিজয়া দেবীর সঙ্গে আপনার একটু ইয়ে হয়েছিল—মানে, আমার কথা শুনে আপনি রাগ করছেন না ত হরিহরবাবু?

—না-না, বলুন—শুনছি।

—আপনি নাকি বিজয়া দেবীকে রেজিষ্ট্রী করে বিয়ে করবেন?

—ঠিকই শুনেছিলেন—কিন্তু বিয়ে হবার আর আশা নেই।

—কেন?

—সেই কথাই ত আগে বললাম। বিজয়া ইজ্ ফুল্লি আণ্ডার ভৈরবানন্দস্ ইনফ্লুয়েন্স এ্যাট পেজেন্ট। সে যদি আশ্রমে না আসত, এতদিন আমাদের বিয়ে হয়ে যেতো। কিন্তু এখন দীক্ষা নেবার পর সে আমার প্রতি উদাসীন। বিজয়ার পিছু পিছু আমিও এসে সাধুজীর কাছে দীক্ষা নিয়েছি। কিন্তু বিজয়াকে আমি আর আকর্ষণ করতে পারিনি। সে আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। এক এক সময় ভাবি—

বলে হরিহর হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করে উত্তেজিত ভঙ্গি করল।

রবীন বললে—কি ভাবেন? কি ইচ্ছে হয়?

—থাক সে কথা।

এমন সময় বিনয় চৌধুরী প্রবেশ করল। বিশ বছরের যুবক। ছিপছিপে লম্বা দেহটা তার। ফর্সামত মুখ!

ঢুকেই সে বললে—আমি কি লেট?

—না এখন মাত্র ছটা কুড়ি। দশ মিনিট দেরী আছে।

—সাধুজী কোথায়?

—উনি স্নান করতে গেলেন।

বিনয় পকেট থেকে সিগারেট বের করে আগুন নিয়ে ধরিয়ে টানতে লাগল। বললে—নীলিমা দেবী কোথায়? বিজয়া দেবীকেও ত দেখছি না। হঠাৎ এই জরুরী সভা ডাকার কারণ কি?

—কারণ যে কি তা নিয়ে আমরাও মাথা ঘামাচ্ছি।

—একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়?

এমন সময় এলো নীলিমা। বললে—আপনারা সব এসে গেছেন দেখছি। অথচ বিজয়া দেবীকে দেখছি না।

হরিহর বললে—তিনিও এসেছেন। ওদিকের কোনও ঘরে আছেন।

তারপর রক্তবস্ত্র পরিহিত ভৈরবানন্দ প্রবেশ করলেন। নীলিমা বাদে সকলে তাঁর পায়ের ধুলো নিল।

সাধুজী বললে—তোমরা সবাই এসে গেছ দেখছি। বিজয়া দেবী আসেননি?

হরিহর বললে—উনি বসবার ঘরে আছে।

সাধুজী ভৃত্যকে বললেন—তুই জিনিসগুলো নিয়ে আয়। ওঘরে আছে।

চাকরটি চলে গেলে বিজয়া দেবী এসে দাঁড়ালেন।

বিনয় বললে—এত দেরি হলো কেন বিজয়া দেবী?

—দেখনি সাড়ে ছটা বাজতে দু'মিনিট বাকী আছে?

সকলে গোল হয়ে বসল। ভৃত্য দুটি হতে দুটি ট্রে নিয়ে প্রবেশ করল। একটাতে খালি কাঁচের গ্লাস আর একটাতে জার। কাঁচের জারে সিদ্ধির সরবৎ। সেটা রেখে সে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

ভৈরবানন্দ বললেন—তোমরা সকলেই এসে গেছ দেখতে পাচ্ছি। আজ বিজয়া দেবী কেন যে এই মিটিং ডেকেছেন তা জানি না। আশা করি তিনি তা জানাবেন। তার আগে আমাদের নিয়মিত ক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করতে হবে।

ভৈরবানন্দ ট্রের উপর থেকে ডান হাতে জারটি আর বাঁ হাতে গ্লাস তুলে নিলেন। কয়েক মুহূর্ত ধ্যান করে সাধুজী রবীনের হাতে গ্লাস দিলেন। সে ধরে রইল—তাতে খানিকটা সিদ্ধির সরবৎ ঢাললেন। তারপর গ্লাস গেল হরিহরের হাতে—তারপর বিনয় চৌধুরী ও নীলিমার হাতে। সবশেষে বিজয়ার হাতে। এইভাবে হাতে ঘুরতে ঘুরতে গ্লাসটি পূর্ণ হলো।

তখন ট্রের উপরে রেখে ভর্তি গ্লাসটা হাতে নিলেন ভৈরবানন্দ।

বললেন—আমি এক্ষুণি মন্ত্রদ্বারা এই সরবৎকে বিশুদ্ধ কারণ সুধায় পরিণত করছি।

কয়েক মিনিট চোখ বুজে তিনি ধ্যানস্থ থাকার পর বললেন—বিজয়া, এই নাও, পান কর। তারপর পরবর্তী সদস্যদের হাতে দাও। এইভাবে তোমরা সকলে অমৃত-সুধা পান করে জ্ঞান, বুদ্ধি ও আত্মজ্ঞান লাভ কর।

ভৈরবানন্দের হাত থেকে গ্লাসটি নিয়ে দু'ঢোক 'কারণ' পান করলেন বিজয়া দেবী। তারপরই তিনি বলে উঠলেন—উঃ! তাঁর শরীরটা পাক দিতে দিতে মোচড় দিয়ে উঠল। মুখটা বিকৃত করে পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি বিনয় গ্লাসটা ধরে ফেলল। গ্লাসটা টেবিলে রাখল সে। তারপর কাত হয়ে এলিয়ে পড়লেন বিজয়া দেবী।

বিনয় বললে—সর্বনাশ, বিজয়া দেবীর কি হলো? হঠাৎ এমন করে নেতিয়ে পড়লেন কেন?

ভৈরবানন্দ বললেন—ওঁর আবেশ হয়েছে। তোমরা বিরক্ত করো না ওঁকে।

বিনয় বললে—না-না, আবেশ-টাবেশ নয়—দেখছেন না, মড়ার মতো পড়ে আছেন?

রবীন নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে বিজয়া দেবীর পাল্‌সটা ধরে বললে—সর্বনাশ!

বিনয় বললে—কি দেখলেন?

—শী ইজ ডেড!

হরিহর লাফ দিয়ে উঠে বললে—ডেড? বিজয়া মারা গেছে? না-না, এ অসম্ভব।

বিনয় বললে—উঃ, সাংঘাতিক কাণ্ড—হরিবল্ (horrible)।

রবীন বললে—এক্ষুণি পুলিশে খবর দিতে হবে।

সাধুজী চিন্তিতভাবে বললেন—কেন, পুলিশে জানানোর কি প্রয়োজন?

বিনয় বললে—সত্যিই ত, পুলিশ ডেকে লাভ কি? সে অনেক ঝামেলা।

রবীন বললে—না, এসব রিকস্ আমাদের হাতে নেওয়া উচিত নয়? পুলিশে জানাতেই হবে। বোঝা যাচ্ছে গেলাসের পানীয়ই ওঁর মৃত্যুর কারণ।

কেউ তাকে বাধা দিল না।

।। তিন।।

পুলিশী তদন্ত

রবীন চাকরটাকে ডাকল। সে এসে বললে—শোন, পুলিশে ফোন করে দাও যে আনন্দ আশ্রমে একজন মারা গেছেন। ও ঘরে ফোন আছে? পুলিশ যেন অবিলম্বে আসে।

—ফোনটা ধ্যানকক্ষে আছে বাবু—পাশের ঘরে। প্লাগটা লাগালেই হবে।

—ঠিক আছে, তাহলে আমিই ফোন করে দিচ্ছি। তুমি যাও। পুলিশ এলে উপরে নিয়ে আসবে।

সে চলে গেল। রবীন ফোন ধরে ডায়াল করল। বললে—পুলিশ হেড কোয়াটার্স?

—ইয়েস, লালবাজার।

—শিগ্‌গির আপনারা আসুন। এখানে একজন ভদ্রমহিলা সন্দেহজনকভাবে মারা গেছেন। সরবতে চুমুক দিয়েই তিনি মারা গেছেন। অথচ আগে বেশ সুস্থ ছিলেন। রীতিমত জটিল ব্যাপার!

—ভদ্রমহিলা কে? কখন ও কোথায় ঘটেছে এটা?

—ভদ্রমহিলার নাম বিজয়া দেবী। ঘটনাটা ঘটেছে মিনিট পাঁচেক আগে অর্থাৎ সাতটায় আনন্দ আশ্রমে।

—ও আশ্রম আমরা চিনি। আপনার নাম কি?

—রবীন!

—এক্ষুণি আমরা আসছি। কিছু নাড়াচাড়া করবেন না।

একটু পরেই হোমিসাইড-এর ও.সি. মিঃ সেন প্রবেশ করলেন সেখানে। সঙ্গে পুলিশের ডাক্তার, ডাঃ চন্দ্র।

প্রখ্যাত রহস্য অনুসন্ধানী দীপক চ্যাটার্জিকে ফোন করা হয়েছিল, আধঘণ্টার মধ্যে সেও এসে পড়লো ঘটনাস্থলে।

দীপক বললে—ডেডবডি নাড়াচাড়া করেননি তো আপনারা?

—না, যেভাবে তিনি মারা গেছেন তেমনি ভাবেই শুয়ে আছেন। শুধু মাঝখানে একবার রবীন গিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল।

ডাঃ চন্দ্র বললেন—এ কেস অফ পয়জনিং। মনে হয় পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়েই মৃত্যু।

দীপক বললে—মিঃ সেন, ডেডবডি পোস্টমর্টেমে পাঠান।

দু'জন কনস্টেবল এসে মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল।

দীপক বললে—মিঃ সেন, এবারে পাশের বাড়ি থেকে দু'জন সাক্ষী আনুন। সকলকে সার্চ করতে হবে। আর আপনাদের লেডি পুলিশকেও ফোন করুন। সার্চ থেকে কেউ বাদ যাবে না।

সাধুজী বললেন—কি প্রয়োজন সার্চ করার?

—এজন্যে আমরা দুঃখিত। কিন্তু এটাই ডিউটি, করতেই হবে। এবার বলুন ত কিভাবে মৃত্যু হলো?

ভৈরবানন্দ আজকের আকস্মিক মিটিং আহ্বান এবং কিভাবে সরবৎ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে বললেন। নীরবে শুনল দীপক।

একটু পরে একজন কনস্টেবল দু'জন ভদ্রলোককে নিয়ে ঢুকল। মিনিট পনেরোর মধ্যে লালবাজারের একজন লেডি পুলিশ এসে গেলেন।

মিঃ সেন প্রথমে সার্চ করলেন রবীনকে! তার কাছে কিছু সাধারণ জিনিস ও নোটিশটা পাওয়া গেল। মিটিংয়ের নোটিশ। মিটিংয়ের নোটিশটা বাদ দিয়ে সব ফেরত দেওয়া হলো। এইভাবে সবাইকে সার্চ করা হলো। সব শেষে ভৈরবানন্দ। তাঁর কাছেও ঐ মিটিংয়ের নোটিশটা পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেল এক গোছা চাবি।

দীপক বললে—এসব কিসের চাবি সাধুজী?

—আমার সুটকেশ, ট্রাঙ্ক, সিন্দুক প্রভৃতির।

সার্চ শেষ হলে সাক্ষী দু'জন বাদে আর সকলকেই পাশের ঘরে যেতে বলা হলো।

তারা চলে গেল। দীপক তখন বললে—মিঃ সেন দুটো শিশি চাই।

মিঃ সেন তাঁর সামনে ব্যাগটা খুলে দুটি ছোট খালি শিশি বের ক'রে দিলেন। দীপক বললে—একটিতে থাকবে জার-এর, অন্যটিতে নিতে হবে একটু গ্লাসের সরবৎ। টেস্ট করতে হবে।

সরবৎ ঢালতে ঢালতে হঠাৎ চমকে উঠল দীপক। বললে—একি মিঃ সেন! গ্লাসের তলার দিকে এই সরবতের মধ্যে একটা ছোট কাগজের টুকরো কেন? ভিজে নরম হয়ে গেছে। ওটাকে শুকোতে হবে।

তারপর সাক্ষীদের বললে—সব দেখলেন ত? এই দুটো লিকুইড যাচ্ছে টেস্ট হতে। আর এই দেখুন গ্লাসের মধ্যে কাগজের টুকরো। দরকার হলে কোর্টে সাক্ষী দিতে হবে। নিন—সই করুন।

তারা সই করল। তারপর বললে—আমরা যেতে পারি কি?

—না, আর একটু দাঁড়ান। সার্চ শিটে সই করতে হবে। এই কামরাও সার্চ হবে।

ফরাস উল্‌টে-পাল্‌টে তন্ন তন্ন ক'রে কামরাটি সার্চ করা হলো। কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু দীপক বিনয় চৌধুরীর খাওয়া সিগারেটের টুকরো হাতে তুলে নিয়ে বললে—মিঃ সেন, এর পর জবানবন্দী নিতে হবে সকলের।

সার্চের পর সাক্ষী দু'জন বিদায় নিল সার্চ শিটে সই ক'রে। সার্চ শিটে লিস্ট করা হলো কাঁচের গ্লাস আর জার, মিটিংয়ের ছ'টা নোটিশ, কাগজের টুকরোটা, আর বিনয় চৌধুরীর সিগারেটের টুকরোটা।

ঘরের মধ্যে শুধু মিঃ সেন আর দীপক।

বাইরে দু'জন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে।

অখণ্ড নীরবতা।

সেই নীরবতা ভঙ্গ ক'রে দীপক বললে—এ কেসটা বেশ জটিল মিঃ সেন। তাছাড়া ঘটনা দেখে সবাইকে সন্দেহ করা চলে। কারণ প্রত্যেকের হাত ঘুরে ঘুরে গ্লাসটা এসেছিল বিজয়া দেবীর হাতে।

—আমার মনেহয়, জার-এর সরবতে বিষ পাওয়া যাবে না—গ্লাসের সরবতে পাওয়া যাবে। কেউ মিশিয়েছে। তবে সব জানা কেমিক্যাল এনালিসিসের রিপোর্ট গেলে।

—কেসটা সুইসাইডও ত হতে পারে। হয়ত বিজয়া দেবী নিজেই কোন কারণে—

—তা হতে পারে। দীপক তারপর সিগারেটের টুকরোটা শুঁকে বললে—এটা সার্চ লিস্টে কেন লিখে নিলাম জানেন? এতে পাচ্ছি কোকেনের গন্ধ। বিনয় চৌধুরী কোকেন মেশানো সিগারেট খান। উঃ, আচ্ছা কাণ্ড আনন্দ আশ্রম! সিদ্ধির

সরবৎ, কোকেন মেশানো সিগারেট—পটাসিয়াম সায়ানাইড, খুন—

—তা বটে।

—যাক, এবার ওদের জবানবন্দী নেব। একে একে পাঠিয়ে দিন।

—মিঃ সেন পাশের ঘর থেকে প্রথমে ধীরেনবাবুকে ডেকে আনলেন।

দীপক প্রশ্ন করল—আচ্ছা, এ মৃত্যু সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

—আমার কোনও অভিমত নেই।

—আনন্দ আশ্রমের সঙ্গ কতদিনের সম্পর্ক আপনার?

—প্রতিষ্ঠার সময় থেকে।

—বিজয়া দেবীকে কতদিন চেনেন?

—মাস তিন-চার আগে উনি আশ্রমে আসেন। তখনি পরিচয়।

—অন্য সকলের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ছিল?

—গুরুভাই ও গুরুভগ্নীর সম্পর্ক।

—কারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ বা শত্রুতা ছিল?

—জানি না। তবে আমার সঙ্গে ছিল না।

—টাকা-পয়সার হিসাব কে রাখে?

—সর্বোচ্চ কমিটি রাখে।

—আচ্ছা, বিজয়া দেবীকেই প্রথমে সরবৎ খেতে দেওয়া হলো কেন?

—এটাই নিয়ম আমাদের। একই গ্লাসে সকলে সরবৎ খায়। সরবৎ আনার সময় সিনিয়রিটির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। আর খাবার সময় জুনিয়র থেকে সিনিয়ার, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে।

—তাহলে আপনারা সকলেই জানতেন যে বিজয়া দেবী সবার আগে চুমুক দেবেন?

—হ্যাঁ।

একটু পরে হরিহর প্রবেশ করল।

দীপক প্রশ্ন করল—বিজয়া কেন এভাবে হঠাৎ মিটিং ডাকলেন, তা কি জানেন?

—না।

—এখানেই কি তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয়?

—না, আগেই। ওঁর স্বামীর বন্ধুর ও বিজনেসের পার্টনার ছিলাম।

—বিজয়া দেবীর আর্থিক অবস্থা কেমন?

—খুব ভাল। স্বামীর প্রচুর টাকা ও সম্পত্তির মালিক উনি।

—এখানে মোটা টাকা দেন নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, গত সপ্তাহে বিশ হাজার টাকা দিয়েছেন।

—টাকা কে রেখেছেন?

—সাধুজী। তিনি সকলের সামনে টাকাটা সিন্দুকে রেখেছেন।

—আর কোন ডোনেশান দিয়েছেন তিনি?

—জানি না।

—আশ্রমের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখে কে?

—সাধুজী।

—আচ্ছা, গ্লাসটি হাত বদলের সময় আজ কিছু একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছিলেন কি অন্য দিনের থেকে?

—হ্যাঁ। আজ সাধুজী একটু বেশী সময় যেন গ্লাস হাতে ধরে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। আর কিছু অস্বাভাবিকতা দেখেছিলেন?

—বিজয়া নেতিয়ে পড়লে সাধুজী বললেন—ওঁর আবেশ হয়েছে। অবশ্য রবীনবাবু তখনই পালস্ দেখেন যে, বিজয়া মারা গেছেন। তিনিই ফোন করেন পুলিশে। সাধুজী বলছিলেন, পুলিশ দরকার নেই।

হরিহর চলে গেলে দীপক বললে—বিজয়াকে বিয়ে করতে ক্ষেপে উঠেছিল হরিহর। বাধা দিয়েছিলেন তাতে সাধুজী। তাই সে সাধুজীর দিকেই আমাদের সন্দেহটাকে ঠেলে দিতে চায়।

এবার বিনয় চৌধুরী প্রবেশ করল।

দীপক বললে—আপনার পেশা?

—টাস টী কোম্পানীর মালিক আমি। আমাদের চা-বাগানও আছে।

—আপনি আনন্দ আশ্রমে কত ডোনেশান দিয়েছেন?

—তা বলতে চাই না। সেটা পার্সোন্যাল ব্যাপার।

—দেখুন, এটা জটিল কেস। আপনার ব্যক্তিগত দু'একটা প্রশ্নের জবাব দিলে সুবিধেই হবে। আজ অবধি কত টাকা দান করেছেন আশ্রমে?

—হাজার চার-পাঁচ হবে।

দীপক বললে—ঠিক আছে, এইভাবে স্পষ্ট উত্তর আশা করি আপনার কাছে।

বিনয় একটু নড়ে-চড়ে বসল। বললে—ঠিক আছে, বলুন আর কি চান?

—আপনি কি বলতে পারেন, স্বামীজী সম্পর্কে বিজয়া দেবীর উপরে আর কারও ঈর্ষা ছিল কি না?

—বলতে পারিন না।

—যখন আপনারা পালা করে গ্লাস-বদল করছিলেন তখন রহস্যজনক কিছু দেখেছিলেন কি?

—না।

—সাধুজী পুলিশে ইন্‌ফর্ম করতে চাননি। এটা কি সত্যি?

—হয়ত তিনি এটা হত্যা বলে ভাবতে পারেননি। তাই—

—আপনি কি ধ্যানকক্ষে সিগারেট খেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আপনার একটা সিগারেট দেবেন?

—এগুলো আমার হাতে পাকানো। তার চেয়ে আমি সিগারেট আনিয়ে দিচ্ছি।

—না, ঐটাই চাই।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা সিগারেট দিল বিনয়। দীপক বললে—আর কিছু জানার নেই। এবার পাঠিয়ে দিন রবীনবাবুকে।

বিনয় চৌধুরী চলে গেল। একটু পরে এলেন রবীনবাবু।

দীপক তাঁকে প্রশ্ন করল—আপনিই কি থানায় ফোন করেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—সাধুজী প্রথমে পুলিশে খবর দিতে আপত্তি করেন?

—হ্যাঁ। মনে হয়, তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি।

আপনি এখানে কতদিন আসবেন?

—আনন্দ আশ্রম চালু হবার সময় থেকেই।

—সাধুজীর সঙ্গে বিজয়া দেবীর সম্পর্ক কেমন?

—গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক।

—কমিটির অন্য কোনও মেম্বারের সঙ্গে কি বিজয়া দেবীর কোনও বিবাদ ছিল?

—না।

—বেশ, এখন আপনি যান। নীলিমা দেবীকে পাঠিয়ে দিন।

এবার এল নীলিমা।

দীপক প্রশ্ন করল—আপনি কোথায় থাকেন?

—এই আশ্রমেই। নীচের তলার একটা ঘরে।

—আর কে কে থাকেন?

—সাধুজী, পাচিকা আর একজন পাচক। তারা পৃথক পৃথক ঘরে থাকে।

—শেষ ঘরে অর্থাৎ কোণের ঘরে কে থাকে?

—পাচিকা রামুর মা। তার পরেই দেওয়াল—তাতে বসানো পেছনের দরজা।

—আপনার বাড়ি কোথায়?

—এই আশ্রমই আমার বাড়ি।

—পৈতৃক বাড়ি।

—সেখানকার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তা আমি বলতেও চাই না।

—বিজয়া দেবীর মৃত্যুতে খুব দুঃখ পেয়েছেন?

—ও-রকম মেয়ের মৃত্যুতে দুঃখ আমি পাই না।

—কেন? আপনিই ত তাঁকে নিয়ে আসেন আশ্রমে?

—এনে ভুল করেছিলাম।

—কেন?

—তা না হলে এ ঘটনা ঘটতো না—নিজেকে সামলে নিয়ে বললে নীলিমা।

—আপনি বিজয়া দেবীর উপর বিরূপ কেন?

—কে বললে বিরূপ?

—আপনার ভাবভঙ্গী। যাক, এবার আপনি যেতে পারেন।

একটু পরে স্বামী ভৈরবানন্দ প্রবেশ করলেন।

দীপক প্রশ্ন করল—আপনি কতদিন এই সাধু জীবন যাপন করছেন?

—দু'বছরের একটু বেশি।

—এর আগে?

—স্কুলের শিক্ষক ছিলাম। তারপর আধ্যাত্মিক পথে আসি।

—আনন্দ আশ্রমের হিসাব-পত্তর সব কি আপনি রাখেন?

—হিসাব জানি না। এক হাতে পাই—অন্য হাতে দান করি। অসহায় দরিদ্র, অনাথ লোককে সাহায্য করি। এটা আমাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়—ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।

—গত সপ্তাহে বিজয়া দেবী যে কুড়ি হাজার টাকা দান করলেন, তা কি খরচ করেছেন?

—না, টাকা সব সিন্দুকে আছে।

—বিজয়া দেবীর সঙ্গে কোনও মেম্বারের কি কোনও মনোমালিন্য ছিল?

—আমি তা জানি না। শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক আছে বলেই জানি আমি।

—বিজয়া দেবীর মৃত্যুর সঠিক কারণ আমরা এখনো ত জানতে পারিনি।

—সরবতে বিষ ছিল। বিষাক্ত সরবৎ খেয়েই বিজয়া দেবী মারা যান। চার-এ সরবৎ করে রেখেছিল কে?

—ভৃত্য রামু।

—আচ্ছা তাকে এরপর প্রশ্ন করব। বাইরের আরও দু'জন সাক্ষী ডাকতে হবে। এবার সিন্দুকটা সার্চ করব আমি।

ভৃত্য রামুকে ডাকা হলো। দীপক প্রশ্ন করল—আচ্ছা, সিদ্ধির সরবৎ কি তুমি

তৈরি করেছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ঐ সময় তোমার সঙ্গে কেউ ছিল?

—না।

—সভ চলার সময় তুমি ছিলে কোথায়?

—পাশের ঘরে।

—আচ্ছা, তুমি যাও।

রামু চলে গেল।

দীপক বললে—সাধুজী, আপনার সিন্দুকটা একবার সার্চ করতে চাই।

—বেশ ত, দেখুন সার্চ করে।

দু'জন সাক্ষী ডাকা হলো তৎক্ষণাৎ। দীপক বললে—আপনাদের সামনে এই সিন্দুকটা সার্চ করে দেখতে চাই। স্বামীজী, এবার এই সিন্দুকটা খুলুন ত।

চেয়ার ত্যাগ করে উঠে তিনি সিন্দুকটা খুললেন। একটা চামড়ার ব্যাগ ও ক্যাশবাক্স বের করলেন তিনি।

দীপক বললে—আর কিছু নেই ভেতরে?

—না।

—চামড়ার ব্যাগেই বোধ হয় বিজয়া দেবীর দেওয়া টাকাটা আছে?

—হ্যাঁ।

—ক্যাসবাক্সে কি আছে?

—খুচরো টাকা এই বাক্সে রাখি।

—দেখুন ত কত আছে?

সাধুজী গুনে বললেন—সাতশো চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

—এবারে চামড়ার ব্যাগটা খুলুন।

—সাধুজী ব্যাগটা খুললেন। কিন্তু আশ্চর্য! তা একশো টাকার নোটের আকৃতির ভাজ করা খবরের কাগজে ভর্তি—ভেতরে টাকা নেই।

সাধুজী বিস্ফারিত চোখে আর্তনাদ করে উঠলেন।

—একি হলো! টাকা কোথায় গেল? বিশ হাজার টাকা কে চুরি করলে? টাকার বদলে খবরের কাগজ রেখেছে এই ব্যাগে কে?

দীপক বললে—একটু শান্ত হোন সাধুজী। আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম।

কয়েক মিনিট কাটল।

দীপক বললে—আপনি টাকার শোকে ভেঙে পড়েছেন দেখতে পাচ্ছি। সিন্দুকের চাবি কি সব সময় আপনার কাছে থাকে?

—হ্যাঁ। সব সময় আমার কাছে থাকে। কিন্তু একটা কথা এখন হঠাৎ আমার মনে পড়ল। আজ দুপুরে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে আমি আমাদের দরিদ্র ভবন আর অনাথ আশ্রম পরিদর্শন করতে গেছিলাম শহরতলিতে। সে সময় সঙ্গে চাবি নিতে ভুলে গেছিলাম আমি।

—চাবি কোথায় ছিল?

—আমার ঘরের টেবিলের ড্রয়ারে।

—আপনি ফিরে এসে চাবিটা ঠিকমত পেয়েছিলেন কি?

—তা পেয়েছিলাম।

—তখন ঘরের মধ্যে বাইরের লোক কে কে এসেছিল তা জানেন?

বিনয় এসেছিল জানি। সে মাত্র পাঁচ মিনিট ছিল। তার সঙ্গে ছিল ঝি। সে আমার খোঁজ করেই চলে যায়।

—আপনার অনুপস্থিতে কে কে ছিলেন?

—ভৃত্য রামু আমার সঙ্গে গেছিল। আর ছিল নীলিমা।

—ওদের ঘরও সার্চ করতে হবে মিঃ সেন।

মিঃ সেন উঠতে যাবেন এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

লালবাজার থেকে ফোনে জানাল যে প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়া গেছে জার-এর সরবতে বিষ ছিল না, ছিল গ্লাসে। পটাসিয়াম সায়ানাইড।

—থ্যাঙ্ক ইউ। আমার তদন্তের পথে এটাই যথেষ্ট মনে হয়। রামুকে তাহলে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হলো।

একটু পরে মিঃ সেন সার্চ করে ফিরে এসে জানালেন যে কিছু পাওয়া গেল না। দীপক তখন সাক্ষীদের দিয়ে সই করালো যে, সাধুজীর সিন্দুকে সাতশো চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পাওয়া গেছে এবং ব্যাগে কাগজ পাওয়া গেছে।

সাক্ষীরা সই করে চলে গেল।

সাধুজী পাশের ঘরে গেলেন। দীপক ঝিকে ডেকে পাঠাল। প্রশ্ন করল—তুমি আজ সারাদিন ঘরেই ছিলে?

—হ্যাঁ বাবু।

—আজ দুপুরে সাধুজী যখন বাইরে গেছিলেন তখন ওঁর সিন্দুক থেকে কুড়ি হাজার টাকা চুরি গেছে। তিনি ভুল করে সিন্দুকের চাবি ড্রয়ারে রেখে গেছিলেন। ঘরে তুমি আর নীলিমা ছাড়া কেউ ছিল না। নিশ্চয় তোমরা কেউ চুরি করেছ।

ঝি হাউ মাউ করে কেঁদে বলল—কি হবে গো। দুপুরে নীলিমা ওপরে ওঠেননি—আমিও না। কেবল বিজয়া দিদিমণি এলেন একবার।

—বিজয়া দেবী?

—হ্যাঁ। তিনি আসেন দুপুরে। দোতলায় একবার উঠেই নেমে যান একটু পরে।

—কখন?

—বাবাঠাকুর যাবার আধঘন্টা পরে।

—তুমি কি করে দেখলে?

—বাবাঠাকুর যাবার পর আমি গলির দিকের খিড়কির দরজা খুলে পান আনতে যাই। ফিরে এসেই দেখি বিজয়া দিদিমণি উঠছেন।

—বাইরে কতক্ষণ ছিলে তুমি?

—আধঘণ্টা মতো হবে। ফিরে এসে আমি আমার কামরায় গেলাম। তার দশ মিনিট পরে আমার ঘর থেকে দেখলাম বিজয়া দিদিমণি চলে যাচ্ছেন।

—তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল?

—না। দেখলাম গম্ভীর। মনে হলো কারও উপরে খুব চটে গেছেন।

—আর কাউকে দোতলায় উঠতে বা নামতে দেখেছিলে?

—না বাবু। আমি টাকা চুরি করিনি বাবু—আমাকে ধরে নিয়ে যেয়ো না।

—না না, তোমাকে ধরব না। তুমি পাশের ঘরে গিয়ে বসো।

দীপক তারপর বললে—মিঃ সেন, ও-ঘরে গিয়ে আপনি হরিহরবাবুকে জিজ্ঞাসা করে আসুন—বিজয়া দেবীর এ্যাটর্নী কে? কেসটা বেশ ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠল। বিজয়া দেবী আসেন দুপুরে। উপরে গিয়ে কিছু দেখে খুব রেগে যান। নেমে চলে যান তিনি। মনে হয়, সেই কারণেই তিনি হঠাৎ সভা ডেকেছিলেন।

—তা হতে পারে।

মিঃ সেন গিয়ে বিজয়া দেবীর এ্যাটর্নীর ঠিকানা জেনে ফিরে এসে বললেন—ঘোষ এন্ড কোম্পানী!

—একজন অফিসারকে লালবাজারে এক্ষুণি ফোন করে দিন মিঃ সেন।

—কেন?

—বিজয়া দেবীর উইল সম্পর্কে সব খবর জানতে চাই। সে যেন খবরটা জেনেই এখানে ফোনে তা জানিয়ে দেয়।

—ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা। বিজয়া দেবী যখন উপরে যান তখন উপরে কেউ ছিল মনে হয়। কে সে?

দীপক একটু চিন্তা করে বললে সেটাই ত বের করতে হবে।

মিঃ সেন ফোন করে ফিরে এলেন। দীপক তাঁকে বললে—এবার গিয়ে আপনি ধীরেনবাবু, রবীনবাবু, সাধুজী, নীলিমা, বিনয় চৌধুরী এঁদের সকলকে গোপনে প্রশ্ন করে আসুন, দুপুরে একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত তাঁরা কে কোথায় ছিলেন।

মিঃ সেন প্রশ্ন করে ফিরে এসে দীপককে বললেন—দুপুরে একটা থেকে তিনটে অবধি নীলিমা দেবী নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন ঝি দেখেছে তা। সাধুজী যান দরিদ্র ভবনে। হরিহরবাবু নিজের কোম্পানীতে ছিলেন—সকলে দেখেছে। বিনয় চৌধুরী এখানে এসে এক মিনিট পরেই ফিরে যান। তারপর নিজের বাড়িতেই ছিলেন। ধীরেনবাবু ছিলেন নিজের ফ্ল্যাটে। আর রবীনবাবু নিজের হোটেলের পেছন দিকে নিজের ঘরে ছিলেন।

—আপনি একজন অফিসার পাঠিয়ে সব ঠিকানাগুলোতে ভেরিফাই করতে বলুন। ভেরিফাই না করে কিছু করা যাবে না।

—ঠিক আছে।

মিঃ সেনের নির্দেশে একজন অফিসার বেরিয়ে গেলেন।

দীপক বললে—এখন আধ-ঘণ্টা বিশ্রাম আমাদের এই সময় একটু চা খেয়ে নিলে হয়। রিপোর্টগুলো সব এলে, আমি কেসটা সল্‌ভ করে দিতে পারব বলে আশা করি।

মিঃ সেন বললেন—আচ্ছা।

ঘণ্টাখানেক পরে।

চা খেয়ে মিঃ সেন বসে ডায়েরী লিখছিলেন, এমন সময় প্রবেশ করলেন একজন পুলিশ অফিসার। বললেন—আমি লালবাজার থেকে আসছি। এ্যাটর্নীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি প্রথমে বলতে চাইছিলেন না—পরে আমি চাপ দেওয়াতে বললেন যে বিজয়া দেবী সব সম্পত্তি আনন্দ আশ্রমকে উইল করেছিলেন—তার তিনজন ট্রাস্টি ছিল। এই দেখুন, এই কাগজে সব লেখা আছে।

দীপক কাগজ দেখে বললে—এ উইলের ট্রাস্টি ছিলেন সাধুজী, রবীন আর ধীরেন। আজ দুপুর বেলা তিনটেতে তিনি সেখানে গিয়ে একজন ট্রাস্টির নাম কেটে বাদ দেন। কেন এই লোকটির নাম বাদ দিতে চাইলেন বিজয়া দেবী?

মিঃ সেন বললেন—কেসটা আরও ইন্টারেস্টিং হলো দেখছি।

এমন সময় আর একজন অফিসার এলেন। তিনি বললেন—সাধুজী ঠিকই গেছিলেন দরিদ্র-ভবনে, তার সাক্ষী আছে। হরিহর ছিলেন তাঁর কারখানাতে। ধীরেনবাবু ফ্ল্যাটে বসে ব্রীজ খেলছিলেন। রবীন মুখার্জিকে হোটেলের কর্মচারীরা পেছনের ঘরে ঢুকতে দেখেছিল। তিনি যে সেখানে ছিলেন তা কেউ সঠিক বলতে পারল না। তবে তিনি ছিলেন মনে হয়, কারণ তাঁকে পথে বের হতে দেখনি। কিন্তু বিনয় চৌধুরী আশ্রম থেকে বাড়িতে গেছিলেন এমন সাক্ষী পাওয়া যায়নি।

দীপক বললে—অর্থাৎ প্রত্যেকেরই Alibi আছে—কেবল বিনয় চৌধুরীর নেই। মিঃ সেন, আমি এদের আবার জেরা করব। আপনি নীলিমা দেবীকে ডেকে পাঠান।

একটু পরে নীলিমা এল।

দীপক বললে—আচ্ছা নীলিমা দেবী, সাধুজীকে নিয়ে আপনার আর বিজয়া দেবীর মধ্যে কি লড়াই চলছিল?

—তার মানে?

—মানে আপনি সাধুজীকে ভালবাসতেন। বিজয়া দেবীও অনেকটা তাই—আপনাদের মধ্যে টাগ্ অব্ ওয়ার চলছিল।

—কে বলেছে একথা?

—বিনয় চৌধুরী।

—ঐ কোকেনখোরটা? ও মানুষ নাকি? একটা পশু।

—বিনয় চৌধুরীর ওপর অত চটা কেন আপনি?

—মাপ করবেন, তা আমি বলতে পারব না।

—ও-আচ্ছা, বিনয় কোকেন কোথায় পায়?

—যেখানে পায় সেখানেই যায়। কুকুরের মত ছোটে। এখানে ত আসে ঐ জন্যেই—ভক্তি-টক্তি সব বাজে—আসলে নেশার টানে আসে। ডোনেশন দেয়।

—আচ্ছা, দুপুরে বিজয়া দেবী প্রবেশ করার আগে আপনি কাউকে প্রবেশ করতে দেখেন নি?

—মনে হয় যেন দেখেছি, ঠিক মনে করতে পারছি না—পেছনের দরজা দিয়ে কে প্রবেশ করেছিল।

—আচ্ছা, আপনি মনে করুন পাশের ঘরে গিয়ে।

নীলিমা পাশের ঘরে এলো। সেখানে বসেছিলেন সাধুজী, হরিহর, বিনয়, ধীরেন আর রবীন। নীলিমা পাশে এসে বসল। নিজের মনেই বললে—বিজয়া আসার আগে কে যেন এসেছিল মনে হচ্ছে। ঠিক মনে করতে পারছি না। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। কে এসেছিল তা জানলে তদন্তের অনেক সুবিধা হতো।

বলতে বলতে নীলিমা কুজো থেকে জল ঢালল। খানিক খেয়ে নিয়ে একটা মাথা ধরার ট্যাবলেট খেলো সে তারপর আবার খাবে বলে গ্লাসটা রাখল টেবিলে।

সবাই কথায় মত্ত।

কেউ কারও কথা শুনছে না। সবাই বলে চলেছে। নীলিমা চোখ বুজে চিন্তা করছিল।

একটু পরে নিজের মনেই বললে—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঠিক—বলেই সে আবার জলটা খেল। তার পরেই একটা আর্তনাদ করে পড়ে গেল। নীলিমা জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

রবীন ছুটে গেল পাশের ঘরে। বললে শুনুন স্যার। নীলিমার কি যেন হয়েছে—

দীপক ছুটে গেল। নীলিমার পালস দেখে বললে ডেড। আবার হত্যা। সেই বিষ—পটাসিয়াম সায়ানাইড্।

মিঃ সেন বললেন—পোস্টমর্টেমে পাঠাবো?

—পাঠান। কিন্তু এটা স্পষ্ট—বিজয়া দেবীর যে হত্যাকারী, সেই একে মার্ডার করেছে।

—তা বটে। মনে হয়, পাছে ধরা পড়ে, এই ভয়ে সে এই কাজ করেছে।

দীপক বললে—ধীরেনবাবু, আপনি ও-ঘরে চলুন—আপনাকে জেরা করতে হবে। তারপর সবাইকে করব।

—উঃ। এতো আশ্রম নয়—নরককুণ্ড। পরপর দুটো খুন, চুরি স্মাগলিং—সব চলেছে এখানে।

ধীরেনবাবু এলেন পাশের ঘরে।

দীপক বললে—শুধু একটা কথা জানতে চাই। কে এসব করেছে বলে মনে হয় আপনার?

—আমার মনে হয় সব কিছুর মূলে ঐ বিনয়। লোকটা যেন অদ্ভুত। আর হরিহরবাবু—উনিও হিংসাতে জ্বলে মরছিলেন।

দীপক কোন উত্তর দিল না।

ধীরেনবাবুকে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দীপক আবার ডেকে পাঠায় হরিহরকে।

দীপক বললে—হরিহরবাবু, আপনি নাকি সাধুজীর এবং বিজয়া দেবীর উপরে ভীষণ ক্ষেপে ছিলেন? এমন কি বিজয়া দেবীকে মার্ডার করতেও তৈরী ছিলেন?

—কে বললে একথা?

—ধীরেনবাবু।

—বিজয়াকে হত্যা করব আমি? আমি ওকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতাম। বিজয়া না এলে আমি 'আনন্দ আশ্রমে' আসতাম না। আজ সে মারা গেছে,—আমি ওকে কেয়ার করি না। যত সব ভণ্ডের দল!

একটু থেমে আবার বললে—হত্যার কী মোটভ আছে? রাবিশ! আজ সন্ধ্যায় আমি পানের দোকান থেকে এসে শুনি যে, ধীরেন বলছে—বিজয়াকে বিশ হাজার টাকা ফেরত নিতে দেওয়া হবে না। জানেন একটা কথা?

—কি?

—এই 'আনন্দ আশ্রম' আধ্যাত্মিকতার ধারও ধারে না। এটা একটা ব্যবসায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

—ব্যবসায়ের ভিত্তিতে?

—হ্যাঁ। এই আশ্রমের তিনজন পার্টনার-ধীরেন, রবীন আর ঐ ভণ্ড সাধুজী।

—আচ্ছা, আপনি যান। বিনয় চৌধুরীকে পাঠিয়ে দিন।

হরিহরবাবু চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল বিনয় চৌধুরী।

দীপক প্রশ্ন করল—বিনয়বাবু, আপনি কোকেন মেশানো সিগারেট খান?

—য়্যাঁ! কে বললে একথা?

—আপনার সিগারেট বলছে। আর বলেছেন নীলিমা দেবী। তাই হয়ত আপনি তাঁকে খুন করেছেন এইমাত্র।

—কোকেনের সঙ্গে আজকের দুটো মার্ডার ও চুরির কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

—আছে। আপনি যে আশ্রমে থেকেই কোকেন যোগাড় করেন তা বলেছেন নীলিমা দেবী। হয়ত তাই আপনি তাঁকে—

—নীলিমা বলেছে? শেষ পর্যন্ত সাধুজীকে বিয়ে করেছিল নীলিমা। শয়তানী—ও মরেছে ঠিক হয়েছে।

—সাধুজী আপনাকে কোকেন সাপ্লাই করতেন?

—হ্যাঁ।

—আজ দুপুরে একটা থেকে তিনটের মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন? তার সাক্ষ্য প্রমাণ আছে?

—না, নেই।

—আচ্ছা, আপনি যান। রবীনবাবুকে পাঠিয়ে দিন।

—বিনয় চলে গেল।

দীপক বলল—ভাল ব্যবসা ফেঁদেছেন সাধুজী। স্মাগ্‌লিং অফ্ কোকেন।

মিঃ সেন হাসলেন।

রবীন প্রবেশ করল।

দীপক প্রশ্ন করল—আচ্ছা, রবীনবাবু, একথা কি সত্য যে, আপনি, ধীরেনবাবু আর সাধুজী ব্যবসায়ের ভিত্তিতে এ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন? সত্যি করে বলুন।

—হ্যাঁ, তা সত্যি।

—ধন্যবাদ! আর বিজয়া দেবীর উইলের কথা কিছু জানেন কি আপনি?

—না।

—আচ্ছা, নীলিমা দেবী মারা যাবার সময়, তাঁর ঠিক পাশে কে বসেছিল?

—গোল হয়ে আমরা বসেছিলাম—এই অন্যমনস্ক ছিলাম। তার ঠিক পাশে ছিল বিনয় চৌধুরী।

—ঠিক আছে। আপনি যান। এবারে সাধুজীকে একবার পাঠিয়ে দিন।

—ধন্যবাদ!

একটু পরে সাধুজী এলেন ধীর পায়ে।

দীপক বললে—আচ্ছা সাধুজী, বিজয়া দেবী তাঁর সব সম্পত্তি আশ্রমে দান করে তিনজন এক্‌জিকিউটার করেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কাদের?

—আমাকে, ধীরেনকে আর রবীনকে।

—আপনারা তিনজনে আশ্রমের সমান অংশীদার ছিলেন ত?

—তার মানে?

—মানে, আপনার পার্টনাররা সব স্বীকার করেছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। এখন আর মিথ্যে বলে লাভ নেই। সব স্বীকার করুন। আপনি বিজয়া দেবীর উইলের কথা অন্য দুই পার্টনারকে কি বলেছেন?

—হ্যাঁ।

—বিজয়া দেবী মারা যাওয়াতে আপনাদের তিনজনের বেশি লাভ। তিনি মারা না গিয়ে উইল পাল্‌টে ফেললে এই তিনজনের বেশি ক্ষতি হতো।

—এই উক্তির দ্বারা আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন, তা বলুন।

—আমি বলতে চাই, আপনারা তিনজনে বা আপনাদের একজন বিজয়া দেবীকে হত্যা করেছেন।

—এসব অবিশ্বাস্য।

—আচ্ছা সেকথা পরে হবে। মিঃ সেন, এঘরে সকলকে এবারে পাঠিয়ে দিন।

সকলে এসে বসল ঘরের মধ্যে।

দীপক বললে—আপনাদের জানাচ্ছি যে, আমরা এই তদন্তের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। এই কেস দুটি নারী হত্যার কেস—সেই সঙ্গে বিশ হাজার টাকা চুরি—

ধীরেন আঁতকে উঠল—চুরি! তারপর সে সাধুজীর দিকে চেয়ে বললে—

এসব কি শুনছি? টাকা কোথায়? শীগ্‌গির চল। চাবি থাকে তোমার কাছে। টাকা নিয়ে কোন রকম চালাকি সহ্য করব না আমি।

দীপক বললে—এক-তৃতীয়াংশ বুঝি আপনার পাওনা?

হ্যাঁ। যা শুনেছেন তা ঠিক। চুরি-টুরি বাজে কথা। ঐ ভৈরব টাকা লুকিয়ে রেখেছে নিশ্চয়।

—ঐ দুটি কেস ছাড়াও একটি কেস আছে—তা হলো কোকেন স্মাগ্‌লিং!

—কি বললেন? ভৈরব তলে তলে কোকেন সাপ্লাই শুরু করেছে? কি হে ভৈরব, কি সব শুনছি? তাহলে তুমিই টাকা চুরি করেছ?

দীপক দৃঢ়কণ্ঠে বললে—না, সাধুজী টাকা চুরি করেননি।

দীপক রবীনের দিকে তাকাল। বললে—টাকা চুরি করেছেন উনি, মানে রবীনবাবু। রবীনবাবুর কারসাজির জন্যেই আজ বিজয়া দেবী সভা ডেকেছিলেন।

রবীন রেগে উঠল, বললে—শাট্ আপ, ইউ লায়ার।

দীপক বললে—আমি মিথ্যেবাদী, না আপনি? আজ দুপুরবেলা সাধুজী যখন দরিদ্র ভবনে গিয়েছিলেন বিজয়া দেবী কাকে শাসিয়েছিলেন? কেন তিনি সভা ডাকলেন?

এতক্ষণে মুখ খুলল বিনয় চৌধুরী। বললে—হ্যাঁ, আমি জানি দীপকবাবু সত্যি কথা বলছেন। আমি জানি টাকা চুরি করেছেন রবীনবাবু। আমার কোকেন খাওয়ার কথাই যখন আউট হয়ে গেছে তখন সব বলব।

—বলুন।

—আজ দুপুরে আমি সাধুজীর কাছে রাখা কোকেনের প্যাকেট নিতে চুপি চুপি আসি। এসে দেখি, রবীনবাবু ধীরে ধীরে দোতলায় উঠলেন। আমিও তা দেখে উঠলাম। রবীনবাবু চাবি বের করলেন সুধাজীর ড্রয়ার থেকে। সিন্দুক খুললেন। আমি লুকিয়ে সব দেখতে লাগলাম....

—তারপর? দীপক বললে।

—জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, তারপরই বিজয়া দেবীর হঠাৎ প্রবেশ। তিনি চুরি দেখে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—আজই আমি পুলিশে খবর দেব। তা শুনে রবীনবাবু এগিয়ে এসে বিজয়া দেবীকে বললেন—না না, তুমি খবর দিও না বিজয়া, কাউকে বলো না।

—আশ্চর্য! তারপর?

—তারপর বিজয়া দেবী নিজেকে সামলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বলে গেলেন—আজই আমি মিটিং ডাকছি। তবে তিনি যে উইল-এর মধ্যেই পালটে

ফেলবেন, তা জানতাম না।

রবীন বললে—ঐ সময় ত আমি আমার রেস্টুরেন্টের পেছনের ঘরে ছিলাম। বিনয় কোকেনের ঘোরে কি ভুল দেখে যা তা বকছে।

—রেস্টুরেন্টের কর্মচারীরা আপনাকে ঢুকতে দেখেছিল—বের হতে দেখেনি। ঐ সময় আপনি যে ঘরে ছিলেন তা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। আপনার পক্ষে লুকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাজ শেষ করে ফিরে যাওয়া কিছু অসম্ভব নয়।

—আনন্দ আশ্রমের সামনের কোনও দোকানে প্রশ্ন করুন, আমি দুপুরে এসেছিলাম কি না।

—সামনে দিয়ে তা আসেননি আপনি এসেছিলেন পেছন দিয়ে। যখন ঝি পান খেতে গেছিল ঠিক সেই সময়। ফিরে গিয়েছিলেন পাইপ বেয়ে নেমে। নীলিমা দেবী আপনাকে ঢুকতে দেখেছিলেন—তবে মনে করতে পারছিলেন না। যখন তিনি মনে করার উপক্রম করলেন তখনই আপনি তাঁকে হত্যা করেন। পাছে আপনার সব প্ল্যান ফাঁস হয়ে যায়। নীলিমা দেবী বেঁচে থাকলে সব বলতেন। কিন্তু তিনি মারা গেছেন। তাই তা বলার কেউ নেই ভেবেছিলেন। কিন্তু বিনয়বাবু যে গোপনে সব দেখেছেন তা জানতেন না আপনি।

বিনয় চৌধুরী বললে—আমি সব ব্যাপার নিজের চোখে দেখেছি।

রবীন বললে—মুখ সামলে কথা বলুন বিনয়বাবু। আপনার বিরুদ্ধে আমি কেস করব।

দীপক বললে—ওঁর কথা ছাড়া আরও প্রমাণ আছে। সবই বলছি আমি।

—প্রমাণ আছে? জিজ্ঞেস করলে রবীন।

—নিশ্চয়। প্রথম প্রমাণ, আপনার কাছ থেকে সীজ করা মিটিংয়ের নোটিশ। প্রত্যেকের নোটিশ ঠিক আছে। আপনারটার কোণ একটু ছেঁড়া। ঐ ছেঁড়া টুকরোতে আপনি বিষ ভরে লুকিয়ে রাখেন। পরে তা সরবতে ফেলে দেন। এই সরবতের গ্লাসে এক টুকরো কাগজ আর আপনার নোটিশের ছেঁড়া কোণ মিলিয়ে দেখুন, হুবহু মিলে যাবে।

—আমি চিঠি ছিঁড়িনি। আপনারা হয়ত কেউ ওটা ছিঁড়েছেন প্রমাণ করার জন্যে। সব আপনাদের সাজানো।

—খুব যে বড় বড় কথা বলছেন। শুনুন তাহলে পরবর্তী প্রমাণ।

দীপক একটু থেমে বললে—দুপুরে আপনার চুরি হাতে-নাতে ধরে বিজয়া দেবী রেগে গিয়েছিলেন এবং সেই জন্যেই যে নোটিশ দিয়ে মিটিং কল্ করেন তার প্রমাণ আছে।

—কি রকম প্রমাণ?

—আমি সব বলছি। আপনি বোধহয় জানেন না যে, বিজয়া দেবী তাঁর উইলের থেকে আপনার নাম কেটে বাদ দেন।

—বাদ দেন? কবে? কেন?

—আজই, বেলা চারটেতে।

—কে বললে?

—এই দেখুন এ্যাটর্নী ফার্মের চিঠি। তিনি এটা পাঠিয়েছেন আমাদের প্রশ্নের জবাবে। তিনি সব লিখেছেন স্পষ্ট করে।

দীপক এ্যাটর্নীর চিঠি এগিয়ে দিল।

হরিহর রেগে ওঠে হঠাৎ।

বললে—উঃ। বিজয়াকে খুন করেছে এই শয়তান—বদমাশ।

দীপক বললে—শুধু বিজয়া দেবীকে নয়, নীলিমা দেবীকেও। পাছে তিনি বলেন যে দুপুরে বিজয়া দেবী আসার আগে ইনি এসেছিলেন, তাই একাজ করেন উনি।

হরিহর বললে—আমার ইচ্ছে করছে ওকে খতম করে দিই।

—শান্ত হন হরিহরবাবু—তা না হলে আর একটা খুনের কেসে পড়ে যাবেন আপনি।

রবীন হঠাৎ তার হাতের পাথর বসানো আংটিটা মুখের সামনে তুলে ধরতে গেল।

দীপক বললে—সাবধান! মিঃ সেন, উনি আত্মহত্যা করতে পারেন।

দীপক রবীনের হাতটা চেপে ধরল। রবীন তার পকেট থেকে একটি ছোরা বের করতেই দীপক পিস্তল উঁচিয়ে হাত চেপে ধরে ছোরাটা কেড়ে নিল।

তারপর সে বললে—ঐ আংটিতে বিষ আছে, মিঃ সেন। ঐ আংটি সবার অজ্ঞাতেই জলে ডুবিয়ে খুন করেন নীলিমা দেবীকে।

—বলেন কি দীপকবাবু?

ঠিকই বলছি। আংটিটা খুলে নিন। ওটা পরীক্ষা করলেই পটাসিয়াম সায়ানাইড পাওয়া যাবে।

মিঃ সেন আংটিটা খুলে নিয়ে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন রবীনের হাতে।

হরিহর বললেন—এবার আমরা যেতে পারি?

দীপক বললে—নিশ্চয় তা পারেন। সাধুজী, আপনার আশ্রমে কোকেন পেলাম না। তাই ছেড়ে দিচ্ছি আমি আপনাকে। তবে ব্ল্যাক লিস্টে এই আশ্রমের নাম থাকলো। ভবিষ্যতে কখনো এমন কাজ করবেন না।

বিনয়বাবু, আপনি যে রকম নাটকীয়ভাবে এই রহস্যের শেষে সাহায্য করেছেন,

তাতে আপনার কোকেনটা আমরা আইনে ধরলাম না। তবে ভবিষ্যতে এমন করবেন না কখনো। ভবিষ্যতে ঐ রকম কোকেন পোরা সিগারেট আর খাবেন না। আপনি যুবক, চেষ্টা করলে সহজেই এই বিশ্রী নেশা ছেড়ে দিতে পারেন।

সাধুজী বললেন—আপনাদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দীপক বললেন—না, এখনো আমার সব কথা বলা শেষ হয়নি সাধুজী। যে রবীনকে আপনারা এত বিশ্বাস ক'রে এই আশ্রমের একজন অংশীদার করেছিলেন, তাঁর সব পরিচয় কি আপনি জানেন?

—না, তবে যতটুকু জানি—

—সব ভুল। তিনি এখান থেকে যা পাচ্ছিলেন তাতেই তাঁর সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু উনি ভয়ংকর নারীলোভী ও চরিত্রহীন। এই চরিত্রহীনতার সুযোগে উনি চপলা নামের একটি সুন্দরী মেয়ের প্রলোভনে পড়েন। আমি দীর্ঘদিন নানাভাবে ফলো কর সব কথাই জানতে পেরেছি।

—কে এই চপলা?

—এক অপরূপা সুন্দরী নারী। প্রকৃতপক্ষে বলা চলে সে একজন নারীদস্যু। এলাহাবাদ, লখ্‌নৌ, কানপুর, দিল্লী সব জায়গা থেকে এই নারীদস্যু লক্ষ লক্ষ টাকা চীট্ করেছে। তবে সে কখনো ধরা পড়েনি। রবীনের সঙ্গে চপলার খুব ভাব ছিল। কিন্তু তিনি জানতে পারেননি চপলার প্রকৃত পরিচয় কি।

তাই টাকার জন্যে রবীন পাগল হয়ে যান। যে কোনও উপায়ে হোক টাকা তাঁর চাই। তাই এভাবে অন্যায় পথে যা বাড়াতে বাধ্য হন তিনি।

মিঃ সেন বললেন—কিন্তু রবীনবাবু, দীপকবাবুর কথা কি সত্যি!

—তা আম জানি না—আপনারা প্রমাণ করতে পারেন ত চেষ্টা করুন।

দীপক বললে—এখানে চেষ্টা করে লাভ নেই। লালবাজারে গেলেই সব কথা উনি সুড়-সুড় করে বলতে বাধা হবেন।

কেউ কোনও উত্তর দিলে না একথার।

।। চার।।

রবীনের জবানবন্দী

লালবাজার পুলিশ হেড-কোয়ার্টাস।

মিঃ সেনের কাছে ধীরে ধীরে সব কথা স্বীকার করল রবীন।

সে অসাধু ছিল না। চপলার পাল্লায় পড়ে, তার রূপের মোহেই সে অন্যায়

পথে নেমেছিল। কিন্তু পরে জানতে পারে, চপলা একজন দস্যুনেত্রী। ড্রাগন হলো তার দক্ষিণ হস্ত।

চপলা নানা কারণে বিপদে পড়ে এখন নিজে কলকাতায় এসে ড্রাগনের দলে যোগ দেয়। তবে এসব সে জানত না। জেনেছে খুব সম্প্রতি।

মিঃ সেন বললেন—চপলা থাকে কোথায়?

—ঠিক কখন কোথায় থাকে তা আমি জানি না। তবে এখন আছে ডায়মণ্ড হারবারের সমুদ্রতীরে একটি হোটেলে।

—হোটেলে?

—হ্যাঁ। মাঝে মাঝে ড্রাগনও ছদ্মবেশে যায় বলে শুনেছি।

—এখন সেখানে গেলে তাকে পাওয়া যাবে?

—তা যেতে পারেন। তবে সে মাঝে মাঝে কোথায় যেন যায়-দু'চার দিন তার দেখা পাওয়া যায় না।

মিঃ সেন আর কোন কথা বললেন না। রবীনকে লক্‌আপে পাঠানো হলো। দীপক ও মিঃ সেন তখন প্ল্যান করতে লাগলেন কিভাবে অবিলম্বে সেই হোটেলে হানা দেওয়া যায়—দস্যুনেত্রী চপলা ও ড্রাগনের সন্ধানের জন্যে।

পরদিন সকাল সাতটা।

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল সেই হোটেলের ঠিক সামনে। গাড়ি থেকে নামল ছদ্মবেশী দীপক ও রতন। পুলিশ বাহিনী গাড়ি রেখে একটু দূরে অপেক্ষা করতে লাগল।

দীপক প্রথমে গেল ম্যানেজারের ঘরে।

ম্যানেজার বললেন—কার সঙ্গে দেখা করতে চান, স্যার?

—একটি মেয়ে বোর্ডার। তার নাম চপলা বলেই জানি আমি।

—তিনি বর্তমানে ত এই হোটেলে নেই। তিনি বোধহয় গেছেন প্লেজার ট্রিপে।

মাঝে মাঝে সে এমনি প্লেজার ট্রিপে যায় নাকি?

তা যান বলেই ত শুনেছি। সঙ্গে থাকেন স্যুট-পরা একজন ভদ্রলোক। তিনি যে কে, তা জানি না।

দীপক বুঝল, এ নিশ্চয়ই সেই দস্যুনেত্রী চপলার সঙ্গী ড্রাগন।

দীপক বললে—প্লেজার ট্রিপে কোথায় যায়, তা কি কিছু শুনেছেন?

শুনেছি সাগরের তীরে যে বাংলো আছে, সেখানে যান মাঝে মাঝে।

—সেটা কত দূর? কোন্ দিকে যেতে হবে?

—সেটা এখান থেকে এক মাইল দূরে। পশ্চিম দিকে যেতে হবে।

দীপক, রতন, মিঃ সেন ও আরও কয়েকজন স্থানীয় থানার পুলিশকে নিয়ে পুলিশ ভ্যান চলল সেই দিকে।

সাগর-তীরের বাংলোটা মাঝে মাঝে ভাড়া দেওয়া হয় বিভিন্ন বিলাসী ভ্রমণকারীদের।

দীপকরা সেখানে এলো। কিন্তু আশ্চর্য, বাড়ির দরজা সব খোলা—অথচ ভেতরে কেউ নেই। এরা তবে গেল কোথায়?

দীপক চিন্তিত হলো। বললে—এখানে আর ত কোনও বাড়ি নেই। শুধু ঐ একটা বাড়ি দেখা যায় একটু ওপাশে। ওটা কার বাড়ি?

দীপক ও সঙ্গী পুলিশরা এগিয়ে চলল সেই দিকে। দীপক ভাল করে খোঁজ নিল যে, ঐ বাড়িতে কে বা কারা থাকে।

বাড়ির সামনে নেমপ্লেট আঁটা ছিল।

তাতে লেখা ছিল।

এ.এম.ভাটিয়া। মাইকা মার্চেন্ট।

দীপক বললে—কে এই ভাটিয়া দেখা যাক।

বাড়ির সামনে গিয়ে সে কলিং বেল টিপল।

কিন্তু কোনও সাড়া মিলল না। আবার বেল্ টিপতে একজন নেপালী চাকর এসে দরজা খুলে দিল।

—মিঃ ভাটিয়া আছেন?

—না, কেউ নেই।

—আমরা বাড়িটা একবার ভাল করে দেখতে চাই।

—কে আপনারা?

—আমরা পুলিশ।

চাকরটা ভয় পেয়ে গেলো। সেই সুযোগে পুলিশ বাহিনী প্রবেশ করল।

বাড়িতে পাঁচখানা ঘর। সব ঘর সার্চ করেও কাউকে পাওয়া গেল না।

দীপক ভাল করে সব পরীক্ষা করতে করতে দেখল একটা ঘরের দেওয়াল ফাঁপা।

একটা সুইচ খুঁজে পেল দীপক। সেটা টিপতেই দেখা গেল একটা সুড়ঙ্গ পথ। পুলিশের দু'জন সুড়ঙ্গপথে নেমে চলল। পিছনে দীপক ও পুলিশ বাহিনীর

একজন।

হঠাৎ—

সুড়ঙ্গের শেষে একটা বড় ঘরের দরজা দেখা গেল। দু'জন পুলিশ প্লেন ড্রেসে ছিল। তারা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে গেল।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল পুরুষের বেশ-পরা দস্যুনেত্রী চপলা—কোমরে তার পিস্তল। হাতে একটা সাব-মেসিনগান।

পিস্তল হাতে দু'জন এগিয়ে যেতেই সাব-মেসিনগান গর্জে উঠল।

দীপক পিছু হটে গেল। কিন্তু একজনের হাতে গুলি লাগল। তার হাত থেকে পিস্তল ছিট্‌কে পড়ল।

অন্যজন পিস্তল ছুঁড়তে গেল। তারও দেহে গুলি লাগল। সে বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

অবিরাম গুলি ছুটে আসতে লাগল।

দীপক সুড়ঙ্গের একটা দেওয়ালের আড়ালে তখন আত্মগোপন করল। একটু পরে গুলিবর্ষণ বন্ধ হলো।

দীপক ও সঙ্গীরা আহত হয়েছে ভেবে আরও দু'তিনজন পুলিশ নেমে এলো। কিন্তু আশ্চর্য ঘরের মধ্যে তারা যখন প্রবেশ করল, তখন চপলা বা ড্রাগন কাউকেই দেখা গেল না।

দীপর্ক তন্ন তন্ন করে সার্চ করল। অবশেষে মাটির নীচের ঘরে এক দিকে একটা সুড়ঙ্গপথ দেখা গেল। এই পথ কোথায় গেছে তা কে জানে।

দীপক বললে—নিশ্চয়ই এই সুড়ঙ্গপথে ওরা পালিয়ে গেছে।

—এই পথে যাবেন নাকি?

—চলুন, দেখা যাক।

আবার সাবধানে পা ফেলে ফেলে দীপক ও পুলিশ-বাহিনীর কয়েকজন এগিয়ে গেল সুড়ঙ্গপথটা ধরে। সুড়ঙ্গের শেষে দেখা গেল। গহ্বর। সেই গহ্বর মাটির উপরে উঠে এসেছে।

দীপক দেখল তারা সেই বাংলোর ঠিক পেছন দিকে এসে উঠেছে।

কিন্তু ড্রাগন ও চপলাকে কোথাও দেখা যায় না।

দীপক তখন বাংলোটা আবার সার্চ করল। কিন্তু কেউ নেই।

তাহলে অন্য পথ ধরে ওরা কোথায় পালিয়ে গেল।

আহত পুলিশ দু'জনকে উপরে এনে ফার্স্ট এড্ দেওয়া হলো। তাদের আঘাত

ততটা গুরুতর হয়নি।

মিঃ সেন বলল—এখন তাহলে আমাদের কি করা উচিত, দীপকবাবু।

দীপক বললে—আমার মনে হয়, ওদের ধরা যাবে না, মিঃ সেন।

—কেন?

—এখান থেকে পালাবার পথ ওদের তৈরী ছিল।

—তা বটে। তবে এবারও আমাদের ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হবে।

—তা ঠিক। তবে ওরা যে এতটা ছিল তা ভাবতেই পারিনি। মনে হয়, ঐ সুড়ঙ্গ পথে সাব-মেশিনগানটা রেডি করাই ছিল।

সকলে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো তাদের গাড়িতে।

কিন্তু গাড়িতে ফিরে দীপক দেখল গাড়ির মধ্যে একটা ভাঁজ করা কাগজ পড়ে আছে। দীপক কাগজটা খুলে দেখল সেটা একটা চিঠি। তাদের অনুপস্থিতির সুযোগে কেউ চিঠিটা রেখে গেছে!

দীপক চিঠিটা পড়ল। তাতে লেখা ঃ

প্রিয় দীপক চ্যাটার্জী,

দস্যু ড্রাগনকে ধরা অত সহজ নয়, এই কথাটা আবার তোমাকে মনে করিয়ে দিলাম। আশা করি, ভবিষ্যতে আরও সাবধানে সাধারণ অগ্রসর হবে। তা না হোলে তোমার জীবন বিপন্ন। ইতি—

তোমার চিরশত্রু 'ড্রাগন'

চিঠি পড়ে দীপক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—শেষ—

শ্রী স্বপনকুমার

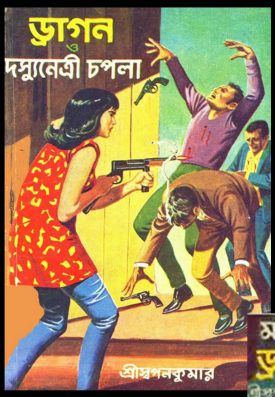

ড্রাগন

সমগ্র